প্রেমপত্র

দিব্যেন্দু পালিত

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ■ কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৮
প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়
মুদ্রাকর :
রণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

শ্রীবাদল বসু,

বন্ধুবরেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের আর একখানি বই

স্ত্রী ও পুরুষ

এই বইয়ের নাম 'প্রেমপত্র'। কেন যে, তা নিজেও জানি না। মনের নিভৃতে যে-সব কথা ও ভাবনার জন্ম চায় একান্তে একতমার কাছে নীরব উচ্চারণ -- পল্লবিত বছর সমাগমে যা হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত, নিতান্তই ব্যক্তিগত সেই ধরনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার অবাধ পাঁচমিশেলে তৈরি বলেই কি ? হতে পারে। নিজেই জানি এর মধ্যে নেই উপন্যাসের শাখা-প্রশাখাময় বিস্তার কিংবা হঠাৎ চমৎকার হয়ে ওঠা ছোটগল্পের শিল্প-সুষমা। নিটোল ভাবনার প্রস্তুতি থেকে বিচ্যুত, এলোমেলো ও খণ্ডিত—কখনো উজ্জ্বল, কখনো বিবর্ণ, এদের তুলনা শুধু বিভিন্ন সময়ে ফোটা, বিভিন্ন রঙের ফুলে তৈরি মালার সঙ্গে। নির্বাচনের দরবারে উচিত মূল্য দিয়ে সকলেই যে স্বচ্ছন্দে তুলে নেবেন, সে-ভরসা কম। তবু, 'প্রেমপত্র'র মূল্যও তো শুধু যে পায় তার কাছেই!

প্রশ্ন, যদি কেউই না পায়, কারও কাছেই না পৌছয় ? তাহলেও ভাবনা নেই। নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে ব্যক্তিগত এইসব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাও মেনে নেবে সেই অমোঘকে, যার নাম মৃত্যু।

—লেখক।

১

* * *

নিন্দুকেরা বলে, মার্কিনীরা একটু বেশি গায়ে-পড়া। চেনা হোক বা অচেনা, পথ চলতে হাসি মুখে তাকালেই হলো। হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে, দন্ত মুখ বিকশিত ক'রে বলবে, 'হাই, হাউ আর ইউ ?' ও দেশে অর্বাচীনরা স্থান কাল পাত্রের ধার ধারে না, চোখে মুখে চিনি চিনি ভাবটুকু থাকলেই হলো। অথচ, আপনার হাসি হাসি মুখের কারণ হয়তো অন্য—কোনো ভোজসভায় যাবার ভূমিকা অথবা নতুন পরিচিতা কোনো সুন্দরী তোষণের মহড়া।

ইংরেজরা ঠিক উল্টো। রেস্তরাঁ, পার্টি বা কোনো পরিচিতের বাড়িতে হয়তো কোনো সন্ধ্যায় পাঁচ মিনিটের আলাপ হয়েছিল, হঠাৎ রাস্তায় দেখে এগিয়ে গিয়ে 'হ্যালো' বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজী পায়রার মতো গলা ফুলিয়ে, কণ্ঠস্বর তিন স্কেল ভারী ক'রে গমগমে ধ্বনি তুলে বলবে, 'হ্যালো'। ভাবটি যেন : অপরাধ ক'রে ফেলেছে, ক্ষমা করলুম। আর কোরো না। ব্যস, শুরুতেই আলাপের দফা রফা।

দুয়ের মধ্যে আছে জার্মানরা। মেপেজুখে চলে। ওদের পলিসি হলো 'গো ইন বিটুইন'। অর্থাৎ, লাইন ধরে চলো।

ড্যুসেলডর্ফ পুলিশ একবার এই নিয়ে খুব ফাঁপরে পড়েছিল।

জনসাধারণ রাস্তা থেকে দু'টি লোককে ধরে এনেছে। একজন রোগা, একটু বা ভীরু, বোকা বোকা চেহারা ; দ্বিতীয় লোকটি গম্ভীর ও রাশভারি, ফোলা মুখের মধ্যে কুঁতকুঁতে দু'টি চোখে গোঁয়ার্তুমি

ভরা। প্রথম জনের নাক ফেটে রক্তারক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনার ব্যাক-গ্র্যাউণ্ড কিছুই প্রায় জানে না ; কেউ কেউ শুধু দেখেছে, স্বাভাবিক পথ চলাচলের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নাকে হুম ক'রে বিরাশি সিক্কার এক ঘুষি ঝেড়ে দিল।

প্রথম তখন নাকের যন্ত্রণায় চিঁচিঁ করছে। জেরা করতে কোনো রকমে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'মহাশয়রা, আমার কোনো দোষ নেই। আমি ওঁর কাছে একটা ঠিকানা জানতে চেয়েছিলুম মাত্র। বলা নেই কওয়া নেই ঐ লোকটা হুম ক'রে ঘুষি মারল। ব্যাটা মরলে নরকে যাবে।'

চেহারা দেখে মনে হয় বদমেজাজী ও রগচটা। তবু প্রথমের অবস্থা দেখে দ্বিতীয়র বোধহয় করুণা হলো। করজোড়ে বলল, 'মহাশয়রা, আমার নরক বাসই হোক। কিন্তু, আমারও কোনো দোষ নেই। আসলে যথোচিত সম্বোধন না ক'রেই লোকটি আমার কাছে ঠিকানা জানতে চেয়েছিল।'

পুলিশ পড়ল মহা ফাঁপরে। একবার এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই তো!' একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই তো।'

গাঁজাখুরি গল্প, সন্দেহ নেই। তবু, এই গল্পেরও একটা অর্থ আছে, ইংরিজীতে যাকে বলে ম্যরাল। ভদ্রতা মেনে চলো।

ভদ্রতা কাকে বলে? সভ্যতার কুইক মার্চের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ দেশে কিছু না কিছু উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে ; বিভিন্ন দেশে বিশেষত পশ্চিমে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণের অন্ত নেই। কুকুর ও মানুষ একই সঙ্গে রকেট চেপে পাড়ি দিচ্ছে চাঁদে ; হরমোন চেঞ্জ হয়ে গোঁফ দাড়িঅলা জলজ্যান্ত পুরুষ রূপান্তরিত হচ্ছে কোমলতনু নারীতে। আমেরিকা তো কবিতার ক্লাস খুলে নয়েছয়ে জন্ম দিচ্ছে কবির ; কবিত্ব শক্তির মতো প্রতিভাসাধ্য ব্যাপারটিকে ওরা বাংলাদেশের চেয়েও সহজ ক'রে ফেলেছে। কবিরা মরেন হা

হুতাশ ক'রে, তাঁদের আর কদর নেই। কিন্তু, 'এখানে অল্প আয়াসে টাইপ শেখানো হয়'-এর মতো 'এখানে ভদ্রতা শেখানো হয়' গোছের কোনো বোর্ড বিশ্বের কোথাও কারও চোখে পড়েছে বলে শোনা যায়নি এখনো। ভদ্রতা কি বস্তু সে সম্পর্কে অবহিত থাকলে মার্কিনীরা অন্তত স্কুল না খুলে ছাড়ত না।

অথচ, ভদ্রতা কাকে বলে কেউ না জানলেও ভদ্রতা ব্যাপারটি যে অত্যন্ত পুরনো সে বিষয়েও সন্দেহ নেই কোনো। ভদ্রতার আইডিয়াও যে সুপ্রাচীন, তা নিয়েও কেউ দ্বিতীয় মত পোষণ করেন না। বাংলা অভিধানে 'ভদ্র' কথাটিকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে মাঝখানে ড্যাস (—) সংযোগ ক'রে সমার্থবোধক অনেকগুলি শব্দ বসানো হয়। যথা : মার্জিত-রুচি-ও-আচরণ-সম্পন্ন, শিষ্ট, সভ্য, সজ্জন, উচ্চ সমাজভুক্ত, হিতকর, সাধু ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাৎপর্য মিলিয়ে দেখলে ভদ্র ব্যক্তির সন্ধান মেলা মোটেই দুরূহ নয়। কে না জানে যুধিষ্ঠির অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। হেক্টরও ছিলেন। আলেকজাণ্ডার লোকটি অত্যন্ত পাষণ্ড ও রাজ্যলোভী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পুরুর প্রতি স্রেফ ভদ্রতার খেল দেখিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন!

বলা বাহুল্য, এদের গুণপনার যা কিছু সবই ভদ্রতা সম্পর্কিত আইডিয়ার ফসল, সারজাত নয়। সমার্থবোধক শব্দগুলির যে-কোনোটি চরিত্রে ঢুকে গেলেই যে আপনি ভদ্র শ্রেণীবাচ্য হয়ে উঠবেন এমন কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। ঘি, ওষুধ বা যাবতীয় বস্তুতে ভেজাল চালানো রীতি হিসেবে সাম্প্রতিক হলেও ভদ্রতার ভেজাল কালের দিক থেকে মনুর চেয়েও পুরনো।

আমাদের প্রতিবেশী ছকুবাবু উচ্চ সমাজভুক্ত, সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যাঁরা অধুনা সুলভ ও তৎকালে দুর্লভ ডিগ্রীর অধিকারী হয়েছিলেন, ছকুবাবুর পিতামহ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু বংশ বনেদীয়ানা সত্ত্বেও প্রাজ্ঞ ছকুবাবু কথায় কথায়

গৃহভৃত্যটিকে 'শ্যালক' সম্বোধনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা বিচলিত বোধ করেন না। ছকুবাবু কি ভদ্রলোক ?

বা, সেই সুপরিচিত বাঙালী কবি—প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া সদ্যযুবকেরা যাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি নিবেদন অর্থে চুষিকাঠির মতো দিবারাত্র ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে রাখে। তিনি ফুল ভালোবাসেন ; তাঁর হৃদয়টিও ফুলের মতো, ভঙ্গীতে যেন সব সময় 'ধরো আমার গলে যাই' ভাব। ইংরাজী অনার্স-পড়া কন্যার নাম রেখেছেন হাস্নুহানা। 'হাস্-নু-হা-না···' নামে মোলায়েম কণ্ঠে যখন কন্যাকে ডাকেন, অতর্কিতে সেই স্বর শুনে মনে হয় কাশ্মীর উপত্যকায় আবার বুঝি হানাদাররা ঢুকে পড়ল। কিন্তু, এহেন নম্র ও শিষ্টাচার-দুরস্ত ব্যক্তিও যখন সাময়িক পত্রে তাঁব নতুন বইয়ের সমালোচনা পড়ে বলে ওঠেন, এঁরা কি সমালোচক ? সব পাজি। মেরে এদেব হাড় গুঁড়ো ক'বে দিতে হয়।—তখন কি বলবেন এঁকে ? ভদ্রলোক !

দৃষ্টান্ত কবুল করে গেলে বিশ্বের কোথাও একজন প্রকৃত ভদ্রলোক খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

তা ব'লে ভদ্রতা নেই এ-কথা ঘোষণা করার মতো দুঃসাহসীও আমি নই। তার ঝুঁকি কম নয়। প্রথমত তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অনুরাগ পরিণত হবে সন্দেহে ; পথে, মাঠে আড্ডায় সচল ব্যবহার ব্যাহত হবার সম্ভাবনাও আছে। দ্বিতীয়ত আমাকে যাঁরা আড়ালে অন্তত ভদ্রজন মনে কবেন তাঁরা হয় ক্রুদ্ধ হবেন, না হয় কৌতুক বোধ করবেন। মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেওয়ার লোকের অভাবও হয়তো হবে না।

বরং আপোস বফা ভালো। ভদ্রতা না থাকলেও, ভদ্রতার আইডিয়া আছে : সেই আইডিয়ার মূল্যই বা কম কি। প্রান্তরে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লে যেমন আকাশে চন্দ্রোদয় ধরা পড়ে, অর্থাৎ চাঁদ দেখার জন্যে জানলার গরাদ গলিয়ে গলা বাড়াতে হয় না, তেমনি কেউ ভদ্র কিনা জানার জন্যেও লোকটির পোস্টমর্টেমের প্রয়োজন

নেই। আইডিয়াটুকুই যথেষ্ট, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতোই তা অবলীলায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

প্রতিদিনই আমি এক পথে অফিস যাই, বাড়ি ফিরি সেই একই পথে। রাস্তার মোড়ে রেস্তরাঁর মালিকের সঙ্গে প্রতিদিনই আমার দেখা হয়। প্রতিদিনই যাওয়ার পথে তিনি মৃদু হেসে প্রশ্ন করেন, 'কি, ভালো?' ফেরার পথে ক্লান্ত চোখ তুলে বলেন, 'বাড়ি ফিরছেন?' প্রতিদিনই এক প্রশ্ন দ্ব্যর্থহীন পুনরুক্তি। তিনি জানেন, ভালো না থাকলে আমি অফিসে বেরুব না; আমার ফেরা মানেই বাড়ি ফেরা বৈচিত্র্যহীন তাঁর এই গতানুগতিক প্রশ্নে মাঝে মাঝে বিরক্ত হই। তিনি হন না।

যাক, ভদ্রতা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া গেল।

২

* * *

আমি ইণ্টারভিউ দিতে ভালোবাসি। শুনে কেউ কেউ হয়তো চমকে উঠবেন—সুখে থাকতে আবার ভূতে কিলোয় কেন! কিন্তু, কথাটা সত্যি। খেলোয়াড়ের কাছে যেমন খেলা, ময়রার কাছে যেমন কড়াপাক, বিশেষণহীন আমার কাছে তেমনি ইণ্টারভিউ।

সে কি আমি মধ্যবিত্ত বলে? ঠিক জানি না। বরং ইণ্টারভিউ মধ্যবিত্তের কাছে কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়; সুখকর তো নয়ই। লেখাপড়া শিখলেও গাড়িঘোড়া চড়ার সঙ্গতি তার কোনোকালেই নেই; চাষবাস কি ব্যবসায় তার বরাবরের অরুচি। অগত্যা চাকরি এবং চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ। জীবনে চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ দেননি এমন কোনো মধ্যবিত্ত যুবক আছেন কিনা জানি না।

ইণ্টারভিউয়ের প্রতি আকর্ষণ বলতে নিজেকেই মনে পড়ে। সেই সুবাদে নিজের গুণকীর্তন গেয়ে চাকরির দরখাস্তও কম ছাড়িনি। সব ক্ষেত্রে যে চাকরির আশাতেই দরখাস্ত পাঠিয়েছি তাও হলফ ক'রে বলতে পারব না। মজার কথা, এ পর্যন্ত যে ক'টা চাকরি হাত-ফেরত হলো, তার অধিকাংশই বিনা দরখাস্তে।

ইণ্টারভিউয়ের অজানা রহস্য তবু আমাকে টানে। কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখলে এখনো দরখাস্ত করার জন্যে সড়সড় করে হাত—নাই বা দরকার থাকল চাকরির, ইণ্টারভিউ দিতে দোষ কী! অফিসে ইণ্টারভিউয়ে আমন্ত্রিত প্রার্থীরা যখন থমথমে হাসিমুখ নিয়ে বসে থাকে ওয়েটিং-রুমে, আশপাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবি

ভিড়ে যাই ওদের দলে, খানিক উপভোগ করি ওদের সঙ্গসুখ। আর সে-সঙ্গ যে মধুর ব্যতিক্রম অভিজ্ঞজন মাত্রই তা স্বীকার করবেন। প্রতিযোগিতার সুস্পষ্ট আভাস সত্ত্বেও এমন উদার বন্ধুতা ইন্টারভিউ প্রার্থী ভিন্ন হয়তো আর কারুর মধ্যেই প্রাপ্তব্য নয়।

বস্তুত, ইন্টারভিউয়ের সময় যতোই এগিয়ে আসে ততোই প্রার্থীর মন বদলে বদলে পরিণত হয় নতুন কোনো সত্তায়। আগের মুহূর্তেও যে-ছিল মা-বাবার ছেলে, দাদা-দিদির ভাই, প্রেমিকার দয়িত ইত্যাদি, এই মুহূর্তে সে একজন ইন্টারভিউ প্রার্থী ভিন্ন আর কেউই নয়। বাঙালি গল্পকার ঔপন্যাসিকদের কল্যাণে সে যতোই করুণ ও সমস্যাজর্জর হয়ে দেখা দিক না কেন, ইন্টারভিউয়ের মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থী সে-সব ধারণার বাইরে চ'লে যায়। সন্দেহ হয়, ঠিক ঠিক চাকরিটা হয়ে যাক এমন বাসনাও তার মনে থাকে কিনা! পরিবর্তে দেখা দেয় দুর্বহ ভারশূন্যতা; সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে তার সবচেয়ে আকর্ষণ ও বিরাগের বস্তু অনতিদূরের ওই ভেজানো দরজাটি—যার অন্দরে সম্ভবত একটি বড়ো টেবিলের ওপাশে ব'সে আছেন একাধিক দুর্বোধ্য ব্যক্তি, আর এ-পাশে, ট্রাম্প কার্ডটি আগলে সত্তার নকল দুর্গটি কোনোক্রমে রক্ষা ক'রে যাচ্ছে একজন। এই 'একজন'ই তখনকার মতো অপেক্ষমাণ অন্যান্য প্রার্থীদের আশা-ভরসা হতাশার হেতু।

মনে পড়ছে, জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম এক সরকারী অফিসে। পদটি একাউন্টস অ্যাসিস্টান্টের। গল্প-গুজবে ব্যস্ত থেকেও মনে মনে ডেবিট-ক্রেডিট কষে ঝালিয়ে নিচ্ছি নিজের অধীত অভিজ্ঞতাকে—এ-হেন মুহূর্তে হাস্যমুখ বেরিয়ে এলো সেই 'একজন'। সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছির মতো তাকে ঘিরে গুনগুনিয়ে উঠলুম সমবেত সকল প্রার্থী। 'কি হলো?' 'কি জিজ্ঞেস করল?'

অপ্রস্তুতভাবে হাসল সেই 'একজন'!—'আকবরের রাজত্বে সবচেয়ে গুণীজন কে ছিল?'

মুখে একটা জবাব এসেছিল তার আগেই কেউ বলে উঠল,

'তানসেন'। সেই একজনের মুখ একটু ফ্যাকাশে হলো। ঠিক তখনই আরেকজন বলল, 'বৈরাম খাঁ।' তৃতীয় জন বলল, 'না, বৈরাম নয়, ইয়ে—। ইস্, নামটা কি যেন, পেটে আসছে মুখে আসছে না—'

ডেবিট-ক্রেডিট ভুলে তৎক্ষণাৎ ইতিহাস জপতে শুরু করলুম। ভাবছি, মুখে হাসিটুকু বজায় থাক, ওটা স্মার্টনেসের লক্ষণ। পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'উত্তরটা কি?' হেসে এড়িয়ে গেলুম। 'জানি না' উচ্চারণ করা মানেই তো গুরুত্ব কমে যাওয়া!

পরে বুঝেছি, সঠিক উত্তর ব'লে কিছু নেই। বিদ্যে বুদ্ধি অভিজ্ঞতায় তুড়ি মেরে ইণ্টারভিউ প্রায়ই একটা ধাঁধা বই কিছু নয়। ধাঁধাটাই আকর্ষণ। কাজে বহাল হবার আগে পাঁচটা অকাজের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে হবে তো! না হ'লে একাউণ্টস্ অ্যাসিস্টাণ্টের চাকরির ইণ্টারভিউয়ে আকবর রাজসভার গুণীজনদের নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি!

দরকার হয়তো একটা আছে; সেটা এফিসিয়েন্সির চেয়ে বেশি প্রফিসিয়েন্সির। সহজ বাংলায়, সবজান্তার। নিজেকে একটা ইয়ারবুক-এ পরিণত না করা পর্যন্ত তরে যাবার ভরসা কি!

আর এক ইণ্টারভিউয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মেরিলিন মন্‌রো ক'বার বিয়ে করেছিল?' চোখ বুজে জবাব দিলুম, 'সাতবার'। প্রশ্নকর্তা ভুরু তুললেন, 'সাতবার, না চারবার?' বললুম, 'না, সাতবারই?' আমেরিকান ফিল্‌ম্ গোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের লেটেস্ট বুলেটিনে ওই খবর আছে। বাড়তি তিনটি গোপনে, নেভার এনাউন্সড।'

জব্বর গুল! প্রশ্নকর্তা থ' মেরে গেলেন। বুঝলুম, প্রার্থীকে কাবু করার জন্যে তাঁর তূণীরে ওই একটিই বাণ ছিল। আর সোজা কথাটি এই, মেরিলিনের বিয়ের সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক কিছুই নেই। এক বন্ধুর কথা শুনেছি, নিজের সম্পর্কে ইংরিজীতে কিছু বলতে বলা

হলে ঘাবড়ে গিয়ে সে ড্যাফোডিল্‌স্‌-এর মুখস্থ সাবস্টান্স আউড়ে এসেছিল। বলা বাহুল্য, এ-দেশে স্কুল-কলেজে যারা একটিও ইংরিজী কবিতা পড়ে, ড্যাফোডিল্‌স্‌ তাদের প্রথম পাঠ্য। গোলমালটা বুঝতে ইন্টারভিউ কর্তাদের দেরি হয়নি ; চাকরিটাও তার হয়নি।

কিন্তু, ইন্টারভিউয়ের সবটাই হয়তো মজার নয়। আমার আকর্ষণ যে অন্যের দুঃখের কারণ হ'তে পারে, সেটা জানলুম আরো পরে ইন্টারভিউ দিতে দিতে যখন পোক্ত হয়ে উঠেছি। এক কমার্শিয়াল হাউসে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখা হলো এক পুরনো প্রতিযোগীর সঙ্গে, অন্তত বিদ্যেবুদ্ধিতে যে আমার চেয়ে অনেক তুখোড়। কিন্তু, আমাকে দেখেই সে বিমর্ষ হলো। বলল, 'এই চাকরিটা সম্পর্কে সিওর ছিলাম, খোঁজখবরও করেছিলাম। এখন বুঝছি হবে না, আপনি আছেন বলেই হবে না—'

চাকরিটা তার হয়নি। আমারও না! সেই ইন্টারভিউয়ের পর থেকে তার সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি। যদি কখনো আবার দেখা হয়ে যায়, বলব, যারা ইন্টারভিউ দেয় তারা কেউ কারো প্রতিবন্ধক নয়। যারা চাকরি পায়, তারা কি সত্যিই ইন্টারভিউ দিতে আসে!

৩

* * *

ভূত নিয়ে আজ আর কেউ ভাবে না। অবস্থার চাপে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুটোর রূপই এখন এমন অনিশ্চিত যে, অলস স্মৃতিচারণার মধ্যেও কেউ আর তাকে স্থান দিতে চায় না। আক্ষরিক অর্থে এ-ভূত যদিও সে-ভূত (অতীত) নয়, তবু বাল্যে এর সংস্পর্শে আসেনি এমন লোকের দেখা হয়তো এখনো পাওয়া যাবে না।

ভূতের গরিমা এখন কিছুটা ম্লান। গল্পে এখনো তাদের দেখা মেলে ক্বচিৎ কখনো—অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকশন যদিও প্রায়ই তাকে ঠেলে দেয় পাশে। এর জন্যে যুগের হাওয়া যতোটা দায়ী, ভূত সম্পর্কে বিভিন্ন অপব্যাখ্যাও ঠিক ততোটাই। ভূত চিরকালই অশ্রদ্ধার পাত্র। কথাটির অভিধানগত অর্থ 'প্রেতাত্মা', অর্থাৎ সে প্রথমে 'প্রেত', তারপরে 'আত্মা'। প্রেত আর কবে মানুষের শুভতা আকর্ষণ করেছে! আরো মুশকিল, বিভিন্ন সূত্রে ভূতের রূপ-বর্ণনা কখনোই একরকম নয়—কখনো সে স্কন্ধকাটা, কখনো কঙ্কাল, কখনো বায়বীয়। এমনই যার অবস্থা, যার অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই—এই যুক্তিমনস্কতার যুগে সে যে স্থায়িত্ব পাবে না, এতে আর আশ্চর্য কী!

অথচ ভূতেরও দিন ছিল। পঞ্চাশ কি একশো বছর আগেও লেখকরা ভূতকে রীতিমতো চরিত্র মনে করতেন। দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ, দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়ার, দৃষ্টান্ত এডগার অ্যালেন পো। তখন ভূতকে মানুষ শুধু ভয়ই পেত না, কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাও করত। কানাই, বাসুদেব,

ত্রৈলোক্য, শিবদাসের মতো ভূতনাথদেরও কদর ছিল কিছুটা। আমার ছোটবেলার সহপাঠীদের মধ্যে অন্তত আধ ডজনের ডাক নাম ছিল 'ভূত'—ডাকনামের একাত্মতায় এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন আর কেউ শখ ক'রে ছেলের নাম ভূত রাখেন না। তাতে প্রেস্টিজ যায়।

তবু, ভূত আর নেই, একেবারেই নেই, এমন তথ্যও বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভূত নামটি চট ক'রে না পেলেও ভূত যে এখনো কাউকে কাউকে পায় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। আমার তরুণ গৃহভৃত্যটি সেদিন বাজার থেকে ফিরে এসে হঠাৎই বলল, দুপুরের ট্রেনে দেশে যাবে। দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাজারে, সেখানেই শুনেছে তার মাকে নাকি ভূতে পেয়েছে। দশ'টা টাকা চাইল। জয়নগর থেকে ওঝা ধ'রে বাড়ি যাবে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না' ভূতে পাওয়ার ধরনধারণ বিষয়েও সে বলতে পারল না কিছু। শুধু এটুকু বোঝা গেল, একাদশীতে উপোস দিয়ে সন্ধ্যায় ডুব দিয়েছিল পুকুরে, সেই থেকে মা নাকি কথা বলছে না, খাচ্ছে না ; শুধু হাসছে।

মন্দ কী, বলতে যাচ্ছিলুম, এই মাগগিগণ্ডার দিনে না খেয়েও যদি কেউ হাসিমুখে থাকতে পারে, তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে! এমন ভূতের সন্ধান পেলে সরকার নিশ্চিত খেতাব দেবেন। বললুম, 'ভূতের দেখা পেলে ধ'রে আনিস সঙ্গে ক'রে।'

ভৃত্যটি চলে যেতে আমার হঠাৎ গোবিন্দর নতুন-বউদির কথা মনে পড়ে গেল।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। গোবিন্দ আমার সহপাঠী। টিফিনের সময় চুপিচুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'নতুন-বউদিকে ভূতে পেয়েছে। চল, দেখে আসবি।'

কৌতূহল এড়ানো গেল না। চললুম স্কুল পালিয়ে ওর সঙ্গে। মনে আছে, উত্তেজনায় সারা রাস্তা কথা ফোটেনি মুখে। একবার

বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলুম 'হ্যাঁরে, নতুন-বউদি কি এখন গাছে চ'ড়ে আছে ?'

ভারিক্কি গলায় গোবিন্দ বলল, 'না, না। ঘরেই আছে। শুয়ে থাকে বিছানায়।'

নতুন-বউদির নাম সুনন্দা। গোবিন্দর দাদা অরুণ মাস দুয়েক হলো তাকে বিয়ে ক'রে এনেছে মেদিনীপুর থেকে। খুব ধুম হয়েছিল বিয়েতে -প্রায় তিনদিন ধরে নেমন্তন্ন খেলুম আমরা, আর, বেশ ভাবও হয়ে গিয়েছিল নতুন-বউদির সঙ্গে। মিশুকে, হাসিখুশী মেয়ে। তাকে হঠাৎ ভূতে পেল ! শুনলুম, একা বেলতলা দিয়ে ফিরছিল, তখনই নাকি ভূতের নিশ্বাস পড়েছে গায়ে। আমরা বেলতলাটা এড়িয়ে গেলুম।

বাগানের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড ! বিছানায় শুয়ে ফুঁ দিয়ে মস্ত এক বেলুন ফোলাচ্ছে নতুন-বউদি। আমরা যে দেখছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই ! হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'এই ফুলি, দেখে যা এক নিশ্বাসে কতো বড়ো বেলুন ফুলিয়েছি ! ধর্, ধর্—'

শুনে ছুটে এলো গোবিন্দর মা। তাড়াতাড়ি দু'আঙুলে বেলুনের মুখটা টিপে ধ'রে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে মা, খুব ভালো হয়েছে—'

গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মাসীমার নাম ফুলি নাকি রে ?'

'ধুস্। মার নাম বাসন্তী।' গোবিন্দ বলল, 'ভূতে, পাওয়ার পর থেকে মাকে ফুলি ডাকছে, বাবাকে পাঁচুয়া। দাদাকে দেখলেই তো দূর হ—দূর হ করে—'

'তোকে ?'

'ধুস্, আমি তো কাছেই যাই না।'

নতুন-বউদি হঠাৎ বিছানার ওপর লাফিয়ে ব'সে বলল, 'ফুলি, বল তো আমার হাতে কী ? বড় নৌকা, না ছোট নৌকা ?'

শুনে আমরা দু'জনেই হাসতে শুরু করেছি। জবাব দিতে গিয়ে গোবিন্দর মা'র চোখ পড়ল আমাদের দিকে। দৌড় দিলুম।

ভূত ঝাড়তে দিন সাতেক পরে ওঝা ডাকা হলো। মাথায় পাগড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর ঝুলো গোঁফ নিয়ে সে এলো পীরপৈঁতি থেকে।

দৃশ্যটা মনে আছে এখনো। উঠোনে গোবরমাটি দিয়ে চারটে বাখারি পুঁতে সুতো জড়িয়ে গণ্ডি করা হয়েছে। মাঝখানে টুলে বসে নতুন-বউদি। তার এক হাতের মুঠোয় কয়েকটা কড়ি, অন্য হাতে শুকনো কাঁকড়া বিছে। দুটো নতুন নারকোল ঝাঁটাকে আটভাগ ক'রে একটা গোছা হাতে নিয়ে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে নতুন-বউদির চারদিকে ঘোরে আর মাঝে মাঝে শব্দ ক'রে ঝাঁটা আছড়ায় মাটিতে। মন্ত্রটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু শুনতে অনেকটা এইরকম ছিল—

'ইংড়ি বিংডি চারটুক্ লক্ড়ি
মার জেনানা হোঁস—
হুম্কা গুম্কা আঁধার মে লড়তা
ভূত প্রেত লক্ড়ি হোঁস—
হুহুম্বা হোঁস্, হুহুম্বা হোঁস ·'

ভূত ঝাড়া চলল ঘণ্টাখানেক। ওঝা যতোই মন্ত্র পড়ে ততোই ছটফট করে নতুন-বউদি, আর মুখটা কেমন মিইয়ে আসে। শেষে টুল ছেড়ে পালাবার চেষ্টায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে শোয়ানো হলো খাটে। ওঝা বলল, ভূত পালিয়েছে। সাতদিনে একেবারে ভালো হয়ে যাবে।

সত্যিই ভালো হয়ে গেল নতুন-বউদি। মাস আট-নয় পরে ফুটফুটে একটা বাচ্চা হলো তার। আটকৌড়িতে আর-এক প্রস্থ খেয়ে এলুম আমরা।

কিন্তু ব্যাপারটা অনেকেই ভুলল না সহজে। নতুন-বউদির ছেলেকে অনেকেই আড়ালে 'ভূতের বাচ্চা' ব'লে ডাকত।

৪

* * *

অন্তত দু'জন নামকরা বাঙালি লেখক গল্প ফেঁদেছেন এদের নিয়ে। প্রথমটির নায়িকা সাধারণ—হয়তো একটু বেশি রকমের সাধারণ—নাহ'লে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তার রূপেব বর্ণনা থাকত। সে-সব কিছুই নেই। শুধু বোঝা যায়, তার বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে, যখন তারুণ্য ছেড়ে যেতে থাকে শরীর, মন হয়ে ওঠে হিসেবী। সে যাকগে, সেদিন সকাল থেকেই মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে যায় বারবার, গরম চায়ে অভ্যস্ত ঠোঁট একচুমুকেই শেষ ক'রে পেয়ালা ভর্তি ঠাণ্ডা চা, বাথরুমের আড়ালে ভুলে যায় গুনগুন করতে, ইচ্ছে ক'রেই সেদিন বেশিটা সময় কাটায় রান্নাঘরে ব'সে। ভাবে, ভেবে যায়। বন্ধুদের বিয়েব রঙীন চিঠিগুলো দুপুরের আলস্যের মধ্যে নেচে বেড়ায় সারাক্ষণ। তারপব বিকেল হয়। তাঁরা আসেন। মুখে ফেস পাউডারের প্রলেপ বুলোতে গিয়ে মনে পড়ে কৌটোটা নতুন, কিছুটা মরীয়া হয়ে বাজারফেরতা কিনে এনেছেন প্রৌঢ় বাবা। তাঁরা ভ্যাখেন, কথাবার্তা বলেন এবং চলে যান। পিছনে পিছনে বাবা। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় সময় কাটানো—কতোক্ষণ আর, পাঁচ কি সাত মিনিট। ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সে অবশ্য বুঝতে পারে সব। মুহূর্তে ঝিমিয়ে পড়ে বাড়ি। আর অন্ধকার ঘরের এক কোণে টাঙ্গাইল শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে সে ভাবে, এবারও হলো না। এই নিয়ে এগারো বার।

অগ্রহায়ণ থেকে শ্রাবণ, দৈনিক কাগজের দুইয়ের পাতা তিনের পাতা ছেয়ে যায় 'পাত্র-পাত্রীর' বিজ্ঞাপনে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিকও

পিছিয়ে থাকে না খুব। কার্তিকে, তাড়াতাড়ি বেলা-ফুরানো এক সন্ধ্যায় ময়দানের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এক থেকে পাঁচ গজ দূরত্বের মধ্যে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করে প্রায়-চল্লিশ একটি যুবক। পেশা—চাকরি, অবস্থা—একা ও দায়দায়িত্বহীন, সুতরাং চ'লে যায়, বাস—আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি বোর্ডিং হাউস। যুবকটি একটি বিশেষ অসুখে ভোগে, যার নাম নিঃসঙ্গতা। এবং এতোদূর বয়সে পৌঁছে বুঝতে পারে সে নারীসঙ্গ চায় এবং—যে-হেতু লাজুক প্রকৃতির ও চাপা—অন্য কারুর মুখাপেক্ষী না হয়ে নগদ যাট টাকা খরচ ক'রে বিজ্ঞাপন দেয় কাগজে। পাত্রীর আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনায় কোনো দাবী থাকে না, এমন কি পরিষ্কার লিখে দেয় 'বিধবা'তেও আপত্তি নেই, বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হওয়া চাই। ইচ্ছে করলে পাত্রী নিজেও পত্রালাপ করতে পারেন। বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি আসে প্রায় তিরিশটি, এর মধ্যে সবচেয়ে নিরহঙ্কারী পাত্রীটিকে সে চিঠি লিখে দেখা করতে বলে। কার্তিকের এক সন্ধ্যায়, ময়দানের একটি নির্দিষ্ট জায়গায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই সে একটি মেয়েকে (যুবতী বলাই ভালো) দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসতে দ্যাখে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে, এই সেই পাত্রী, যাকে সে দেখা করতে বলেছিল। তখন সে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দেয়। তার পরের অংশটুকু অবশ্যই গল্প। যুবকটি জানতে পারে মেয়েটি বিধবা নয়, তার বয়সও পঁয়ত্রিশের অনেক নীচে—এই প্রতারণার সুযোগ সে ইচ্ছে ক'রেই নিয়েছে। কারণ, বিয়ে হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, এবং তা যে-কোনো মূল্যে। মা-বাবা, ভাইবোনদের একটি পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কারুর করুণা ভিন্ন তার বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। মেয়েটি দু'বেলা খেতে চায় এবং চায় একটু আশ্রয়।

একটি ও দু'টি নিয়ে দুই গল্পে মোট চরিত্র তিনটি। কিন্তু, গল্প না ভাবলে, আছে আরও অনেক চরিত্র। প্রথম গল্পে একটি চুপচাপ

ধরনের প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা যায়—যিনি বাজার-ফেরতা মেয়ের জন্যে কিনে আনেন ফেস পাউডার, পাত্রপক্ষের পিছনে পিছনে হেঁটে যান চুপচাপ এবং যাঁর ফিরে আসার ধরনে মুহূর্তে ঝিমিয়ে পড়ে বাড়ি। মেয়েটি বুঝে নেয়, এবারও হলো না। দ্বিতীয় গল্পে বিবাহেচ্ছু পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে পৌরুষ ও নারীত্ব ছাড়াও আরও কিছু—কী, তা বলা মুশকিল। এটা ঠিক, বিয়ের মরশুমে, কলকাতা শহরে অন্তত, একশো দুশো গজের ব্যবধানে পরস্পর-বিরোধী সুরের লড়াইয়ে মেতে ওঠে সানাই, একটার পর একটা বিয়ে হয়ে যায়, রাস্তায় বেরুলেই চেনা যায় কাদের নতুন বিয়ে হলো। কিন্তু, চেনা যায় না কাদের বিয়ে হলো না, এবারও নয়—বা, বিবাহেচ্ছু কোন যুবক অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে হেমন্তের কুয়াশায়।

বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্যা প্রধানত দু'টি। এক, খাদ্য, দুই জনসংখ্যা। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা মাথার চুল ছেঁড়েন, তাঁরা মনে করেন, দু'টি সমস্যাই পরস্পরনির্ভর। অর্থাৎ, খাদ্যের সমস্যা থাকত না যদি জনসংখ্যা হতো অনেক কম এবং জনসংখ্যা বেশি বলেই উৎপাদিত খাদ্য দিয়ে সকলের প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না। এর জন্যে দরকার হলো লাল ত্রিভুজের, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্যে হুটোপাটির। নিয়ন্ত্রণ রইল না প্রচার ও কলমের। এ-দেশে, স্বাধীনতার পর, এক জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়েই কাগজপত্র বইয়ে যতো লেখালিখি হয়েছে, শব্দ গুণে মাপজোখ করলে তার যোগফল গোটা মহাভারত-রামায়ণের শব্দ সংখ্যার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হবে। ফল যে কিছু হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কোনো। ফলে, সম্প্রতি নেতৃস্থানীয়দের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, লাল ত্রিভুজ, পরিবার পরিকল্পনা বা সাবসিডাইজড প্রাইসে 'নিরোধ' কোনো সুরাহা নয়—সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রয়োজন আঘাত করা মূলে, অর্থাৎ আইন ক'রে এক-দু' বছরের জন্যে বিয়ে বন্ধ ক'রে দাও।

এতে সমস্যার সমাধান হবে কি হবে না, সে-কথা আলাদা। বিষয়টা আইন নিয়েও নয়। বিয়ের সঙ্গে প্রজননের কোনো আবশ্যিক শর্ত জড়ানো আছে কিনা সেটাও ভাববার বিষয়। অন্তত সেটা যে কিছুটা পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল—এ যুক্তিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরে, শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অন্তত, যাদের সামনে—খবরের কাগজ, হোর্ডিং, সিনেমা-স্লাইডের মাধ্যমে—অহোরাত্র ঝুলছে 'ভাবুন' বা 'তু'টি বা তিনটির বেশি নয়'-এর নোটিশ, তাঁদের কেউ কেউ যে এবংবিধ নোটিশের সাহায্য ছাড়াই মাত্র একটিও চান না, এমন দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। কিন্তু, প্রজনন ছাড়াও, বিয়ের অন্যান্য মর্যাদা ও প্রয়োজনগুলির প্রতি এঁরা উদাসীন থাকেননি। সে-প্রয়োজন সঙ্গের স্বাস্থ্যের, সামাজিকতার এবং আত্মিক।

এটা ঠিক, একটি বিশেষ বয়সের পর পুরুষ বা নারী যে-কেউই হয়ে ওঠেন দেহ ও মনে স্বনির্ভর, এবং তখনই প্রয়োজন পড়ে তাদের নতুন ও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের—যে-সম্পর্ক বাবা-মা-ভাইবোনের নিকট আত্মীয়তার মধ্যে স্থাপন করা আর সম্ভব নয়। বাবা-মা যখন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগেন, তখন, তার একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই কন্যাদায় নয়, সঙ্গে সঙ্গে উহ্য থাকে উপরোক্ত কারণ-গুলিও। মেয়েরা এখন দিব্যি লেখাপড়া শিখছেন ও চাকরিবাকরি করছেন—সিকিউরিটি নামক বস্তুটি এখন তাঁরা হেসে খেলে অর্জন ক'রে নিতে পারেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলামেশাও এখন চাল সংগ্রহ ক'রে চাট্টিখানি ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার মতোই সরল ব্যাপার। কোনো ঝুঁকি না নিয়ে শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে আনাগোনা করাও তেমন তুরূহ কিছু নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও বিয়ের প্রয়োজন মেটে না, গুরুত্বও কমে না। কারণ পরিষ্কারভাবে তু'টি—সংস্কার ও সামাজিক স্বীকৃতির টান। বয়স যতো বাড়ে, অভিজ্ঞতা যতো পোক্ত হয়, এই তু'টি প্রবণতা ততোই শিকড় বিস্তার করে রক্ত-মাংসে।

সমস্যা হলো, পাত্র-পাত্রীর অভাব যেখানে সামান্যতমও নেই, সেখানেও, কে কাকে বিয়ে করবে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এগুলো নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর, লজিকের হিসেবে এ-তত্ত্বে ভুল নেই কোনো। ভুল আছে তত্ত্বটার প্রয়োগে। অন্তত বিয়ের ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই। অন্তত এই একটি ব্যাপারে ভাগ্য কিছুটা সৃষ্টি করছি আমরা, নিজেরাই—মানসিকতার বিভ্রান্তি দিয়ে, সমস্যাকে আরো বেশি সমস্যার ভিতর ঠেলে দিয়ে। চটপটে একটি গুণী ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আধুনিক মতে যে-মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করল চুটিয়ে—মাখামাখিকে টেনে নিয়ে গেল চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে, পরবর্তীকালে বিয়ের প্রসঙ্গে সেই মেয়েটিই হয়তো অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হবে ছেলেটির চোখে, এবং বিভিন্ন কারণে। এ কথা মেয়েদের প্রসঙ্গেও একই ভাবে খাটে। এই একটি জায়গায় এসে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে চিনে নেয় চোখে-চোখে বা মনে-মনে নয়, ওজন যন্ত্র ব্যবহার করে। একাগ্র হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গুলি। এবং খুব সাবলীল-ভাবে অব্যবহিত ফলকে চালিয়ে দেওয়া হয় ভাগ্যের নামে। তবে, এ-ব্যাপারে মেয়েরাই বোধহয় একটু বেশি কোণঠাসা, একটু বেশি অসহায়। স্বাভাবিক। সাপ-খোপ দৈত্যদানোর উৎপাত থেকে বাঁচার জন্যে এখনো যে তাদের সন্ধ্যে-সন্ধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়!

ব্যাপারটা যে কতোদূর সত্যি, বিয়ের বাজারে পাত্র ও পাত্রী কার দর কেমন এবং চাহিদা কেমন, এটা বোঝবার জন্যে বেশিদূর যাবার দরকার নেই—যে-কোনো রবিবারের কাগজে পাত্র-পাত্রী কলমের বিজ্ঞাপনগুলি খুঁজলেই ধরা পড়বে। এক রবিবারের কাগজ থেকে যথেচ্ছ কয়েকটি নমুনা তুলে ধরলে এ-রকম দাঁড়ায়:

পাত্র চাই :

১। পাত্রী গৌরবর্ণা লাবণ্যময়ী গ্র্যাজুয়েট শিক্ষিকা (২৬) ব্রাহ্মণ। উপযুক্ত পাত্র চাই।

২। বৈশ্য সাহা অবস্থাপন্ন অফিসারের কন্যা, ১-৬০ মিঃ, বি-এ ফাইনাল সুমুখশ্রী মধ্যমবর্ণা।

৩। ঢাকার অফিসার ভ্রাতাদ্বয়ের ভগ্নী, সুশ্রী, বি-এ, জলপাইগুড়িতে শিক্ষিকা (২৬) পাত্রীর জন্যে কায়স্থ পাত্র চাই।

৪। পঃ বঃ সুবর্ণবণিক (২৮) সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা নরগণ গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই।

৫। পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ ভরদ্বাজ অতি সুশ্রী পি-ইউ পাত্রীর (২৪) পাত্র চাই।

পাত্রী চাই :

১। বঙ্গজ কুলীন (৩০) আই এস সি মান গ্লাস ফ্যাকটরিতে ফোরম্যান (৪৫০ টাকা) পাত্রের জন্য গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই।

২। কানাডা প্রবাসী ডিভোর্স ব্যবসায়ী চ্যাটার্জি (২৯) পাত্রের জন্য ২৫—২৬ সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই।

৩। পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ (৩০) আঃ গ্রাঃ দিল্লিতে বাড়ি ব্যবসা। গৌরাঙ্গী প্রকৃত সুন্দরী ভিন্ন পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন।

৪। প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত পঁচিশ অনূর্ধ্ব পঃ বঙ্গ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র সুপুরুষ ব্যানার্জি (৩৬, ৫´—২´´) কঃ সঃ চাকুরে ৬০০ টাকা। দায়হীন ছোট পরিবার। ছবিসহ লিখুন।

৫। ২৮ সুদর্শন এস এফ বোম্বেতে স্থায়ী চাকুরে ৫০০ টাকা বৈদ্য পাত্রের প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাই।

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনগুলির ধরন থেকে একটা খুব মজার এবং—একই সঙ্গে, দুঃখের ব্যাপার ধরা পড়ে। তা হলো : পাত্রীদের জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে একটা যেমন-তেমন বর জোটানোর চেষ্টা —বড়জোর সে পাত্র হবে উপযুক্ত বা উপার্জনশীল। পাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুশ্রী কিন্তু সুন্দরী নন; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কিন্তু

গৌরবর্ণা নন। অথচ পাত্র যেমনই হোক প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের চাই সুন্দরী শিক্ষিতা গৌরবর্ণা পাত্রী এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্যই পাত্রীকে হতে হবে স্বাস্থ্যবতী। পাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দু কান কাটা। মাত্র পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইটের পাত্র অনায়াসে নিজেকে দাবী করে বসেন সুদর্শন হিসেবে; ছত্রিশ বছর বয়স্ক পাত্র চান তাঁর ভাবী পত্নী যেন কিছুতেই পঁচিশের বেশী বয়সিনী না হন। এমনকি মধ্যবয়স্ক 'ডিভোর্স' পাত্রও তাঁর দাবীর ব্যাপারে এতোটুকু সঙ্কুচিত নন; আর স্কুল ফাইনাল পাস এবং এই দুর্দিনের বাজারে মাত্র ৫০০ টাকার চাকরি সম্বল করেও কেউ কেউ 'প্রকৃত সুন্দরী' পাত্রী দাবী ক'রে বসেন। এই অবস্থায় এমনকি শ্রেষ্ঠতম প্রজাপতির পক্ষেও সম্ভব নয় এই পাত্র-পাত্রীদের কারুর সঙ্গে কারুর নির্বন্ধ ঘটানো—যদি না ইতিমধ্যে সেই অভাবিতের হস্তক্ষেপ ঘটে, যার নাম ভাগ্য।

দু' একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, বিজ্ঞাপনে প্রায়ই যাঁদের দেখা মেলে না, তাঁরা হলেন প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী এবং প্রকৃত উজ্জ্বল এবং শিক্ষিত হৃদয়বান পাত্র, বিয়েটা যাঁদের কাছে পণ্য-সন্ধানের চুলচেরা বিচারবুদ্ধির খেলা নয়। কিন্তু এঁরা যে নেই এমন কথা ভাববারও কারণ নেই কোনো। মনে হয় খুব গোপনে কোথাও এই ধরনের পাত্রী এবং পাত্ররা পরস্পরকে গ্রহণ করে নেন। খুঁত ও খুঁতখুঁতুনি নিয়ে বাকী যাঁরা থাকেন তাঁদের ভাগ্যে কী হলো জানবার উপায় নেই। গল্পেই বা ক'জনের জায়গা হয়!

৫

* * *

গ্রীষ্মঋতু বলতে ছোটোদের বইয়ে যা লেখা থাকে তার মধ্যে এক বর্ণও সত্য নেই। কিংবা সত্য হয়তো আছে, কিন্তু বারো মাসে ছয় ঋতুর শুরু যে দুই মাসে, অর্থাৎ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে, দাবদাহে তার প্রচণ্ডতা এতোই বেশি যে ঋতুকর্তাদের মন ও মগজ হয়তো ত্রাহিরবে বর্ষার আবির্ভাব ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল ; ঋতুভেদের হিসেবটাও তাই গিয়েছে গুলিয়ে। না হ'লে বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ শুধু এই দু'মাস জুড়ে গ্রীষ্মঋতু, এই তথ্যে কোন মন সায় দেবে ?

ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত শীতের গ্রেস-পিরিয়ড চালু থাকে কিনা সন্দেহ ; দুপুরের দেড়-দু ঘণ্টা অন্তত গ্রীষ্মের রিহার্সাল জমে ওঠে পথে ও মাঠে—জানলা দরজা বন্ধ করা, হঠাৎ পাখা বন্ধ হওয়া দুপুরে। আর চৈত্র মাস ? তার ভোর-বাতাসে যতোই লেগে থাকুক সোহাগের ছোঁয়া, এমন কি চরম রোমান্টিকও তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ভরসা পাবেন না। চৈত্রই বুঝিয়ে দেয়, দিন আগত। গ্রাম গাঁ আধাশহরে ধুম পড়ে যায় ছাতা মেরামতের কিংবা তালপাতার ছাউনি বাঁধার, সমাজসেবীদের সদিচ্ছায় রাস্তার ধারে ধারে মাথা তোলে জলসত্র। অবিশ্রান্ত পাতা ঝরার নির্মমতায় ন্যাড়া ডালপালা নিয়ে অসহায় গাছগুলি অনর্গল ক'রে দেয় নিজেদের। আকাশ যে অন্তহীন দয়ামায়াহীন শূন্যতার প্রতীক, চোখে রোদ্দুর দিয়ে তা ধরিয়ে দেবার এর চেয়ে প্রশস্ত সময় আর নেই।

শহরের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। বৈদ্যুতিক স্যুইচে হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-আনন্দে নেচে ওঠে পাখার ব্লেডগুলো আর অক্লেশে ছড়িয়ে দেয় মাস দু'তিনের জমে-ওঠা ধুলো—সেই আগ্রহের সঙ্গে

চলে কিসের তুলনা ? থিয়েটার-পাগল নতুন অভিনেতার প্রথম স্টেজে উঠে দর্শকের হাততালি পাবার জন্যে পরিশ্রমের, না কি প্রথম ওভারেই উইকেট পাওয়া পেস বোলারের হিংস্রতার ? হয়তো দুয়েরই। কিন্তু কলকাতাবাসী মাত্রেই জানেন, গরম-তাড়ানো ব্যবহারে বৈদ্যুতিক পাখা যতোই পটু হোক, লোডশেডিঙের দৌরাত্ম্যে ইদানীং তার মহিমা অনেকটাই খর্ব। নির্ভেজাল গরমে কিংবা অন্ধকার গরমে অনুরাগীদের সঙ্গে নখদন্তহীন একই নিয়তি বরণ করা ছাড়া তার আর উপায় নেই কোনো। ঠিক একই রকম নিরুপায় ডাইনিং রুমের কোণের সুদৃশ্য রেফ্রিজারেটর, অফিসে এয়ার-কণ্ডিশানার, একটানা দুর্যোগে জমতে না পারা কুলফি আর আইসক্রীম।

তবু, অনিশ্চিত হলেও, কপাল-ভালো সচ্ছলদের ক্ষেত্রে এই গ্রীষ্মে ঘরে থাকার সুখ আছে ; নিশ্চিত আরামে দিবানিদ্রারও। খসখসের শীতল আমেজ, ফ্রিজে ঠাণ্ডা-করা ডাবের জল কিংবা আইসক্রীম সোডার ঢালাও বন্দোবস্ত এই গ্রীষ্মেও এনে দিতে পারে সোনায় সোহাগার স্বস্তি। আরামই আনে আলস্য। শুতে না শুতেই ঘুম আসার বাধা নেই কোনো। ছিমছাম ভাতঘুম। বস্তুত, আলুথালু নায়িকার চরম সংকটজনক মুহূর্তেও চোখের পাতায় ঘুমের অতর্কিত আক্রমণে হাত থেকে কখন যে খসে পড়ে রগরগে উপন্যাসখানি, কেউই তা জানতে পারে না। শীতের বেলা তো নয় যে বহে যাবে তাড়াতাড়ি। সুতরাং, মন ও পাখা ঠিকঠাক চললে অন্তঃপুরিকাদের কাছে গ্রীষ্ম একেবারে অসহনীয় কিছু নয়।

ভয় আর অস্বস্তি তাদেরই, যারা ঘরেও নেই, অফিসে নেই ; কাজে কিংবা অকাজে যারা কাঠফাটা রোদ্দুর আর পিচগলা রাস্তার সঙ্গ মেনে নিতে বাধ্য। গ্রীষ্মের সূর্য দিনমানের বেশিটা সময়ই মধ্যগগনে। রঙীন সানগ্লাস রোদ্দুরের বর্ণ ও তীক্ষ্ণতায় যতোই বৈচিত্র্য আনুক, শরীরের জ্বালা মেটাতে কোনোই সাহায্য করে না। *এরই মধ্যে যারা পারে তারা টুক করে হারিয়ে যেতে পারে টিকিট*

কেটে ম্যাটিনী শো-র ঠাণ্ডায়, কিংবা কাঁচের দরজা ঠেলে ঠাণ্ডা বীয়ারের খোঁজে। যারা পারে না তাদের আশ্রয় ছিটেফোঁটা সবুজের নিচে, গাছের ছায়ায় কিংবা গাড়ি-বারান্দার তলায়, শুধুই এক গ্লাস জলের অকিঞ্চিৎকরতায়। তখন, এই শহরে থেকেও আমরা বুঝতে পারি 'আল্লা ম্যাঘ দে, আল্লা পানি দে'র উৎস প্রার্থনা-কাতর কোন শুষ্ক ছাতির কোণে। কিংবা কাশীপুর গ্রামের দরিদ্র ভাগচাষী গফুর জোলা পাথরপ্রমাণ কোন শুষ্কতায় পৌঁছে লাঙলের আঘাতে হত্যা করেছিল তার আদরের মহেশকে। মনে পড়ে শরৎবাবুর বর্ণনা— 'কখনো এ রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ সেকথা 'ভাবিতেও যেন ভয় হয়।'

কিন্তু সবকিছুর বেলাতেই যেমন, তেমনি, গ্রামের সত্য তার ভয়ঙ্করতা নিয়ে শহরের স্নিগ্ধতায় হানা দেবে, সে দিন আর নেই। আরামের অসংখ্য উপাদান আর গ্যাজেটের প্রাচুর্যে যারা পারে তারা নিয়ন্ত্রিত তাপের মধ্যে থেকেও সেই অবিশ্বাস্য দাবদাহের কিছুটা ফিরিয়ে আনে বুঝি প্রকৃতিরই তুষ্টির জন্যে। গ্রীষ্মের দুপুরের নিভৃতি থেকে তাই ভেসে আসে রেকর্ড চড়ানো হাহাকার—নাই, রস নাই, দারুণ দহন বেলা।…সে গান ফুরোতে না ফুরোতেই জমে ওঠে ঋতুর আর এক রঙ্গ—বহু যুগের ওপার হতে চলে আসে আষাঢ়।

ঠিকই। মেঘদূত-কে সম্মান জানিয়ে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষা নামে এখনো, কখনো-সখনো। কিন্তু গ্রীষ্মের মান ঘুচে যায় না তাতেই। শিশুপাঠ্য বইয়ের বর্ণনায় আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকাল রূপে ঘোষিত হলেও, এই বর্ষাও নিশ্চিত জ্বালাহর রূপে আসে না। বরং এ-দেশে বর্ষা আসে গ্রীষ্মের ঘরে ভাড়াটে সেজে। যতোই সচল ও স্বাধীন হোক তার ধারা, শেষ পর্যন্ত, সেও যে গ্রীষ্মের নিগড়ে বন্দী! তার শৌখিনতা তাপক্লিষ্ট পৃথিবীতে মেলে দিতে পারে না চিরকালীন মেঘের ছায়া কিংবা শীতল শান্তি। মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে

ওঠে গ্রীষ্ম ; পুরোপুরি দান ছেড়ে দেবার আগে পর্যন্ত মেটে না তার দরদস্তুরের খাঁই। সে থেকে যায়, বৃষ্টির পরেও, আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের আনাগোনার পরেও। পচা গরম বলতেই আমরা বুঝি ভাদ্র মাস—হিসেবমতো শরতের প্রথম মাস। কিন্তু, তাল পাকে ভাদ্রেরই গরমে।

যতোই প্রচণ্ড ও প্রবল হোক, গ্রীষ্মের আধিপত্যের সবটাই যে অ-সুখের, তা অবশ্য নয়। বলতে কি, ঋতুর মধ্যে যা কিছু পৌরুষের তার সবটাই গ্রীষ্মের একার। এমন খোলামেলা, আড়ালহীন স্বাস্থ্য আর কোন ঋতুর শরীরে। সেখানে নেই শীতের ফুলেল আড়ষ্টতা কিংবা শো-কেসের ডামির রক্তহীন সৌন্দর্য। পৌরুষের ধর্মে সে শুধু জ্বালিয়েই ক্ষান্ত হয় না, নিজেও জ্বলে, তার শরীর নিঃসৃত ঘামে অনর্গল ছড়াতে থাকে আম-কাঁঠালের সুগন্ধ। গ্রীষ্মের এই ভরা সৌন্দর্য শুধু যে আদিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতিতেই ধরা পড়ে তা নয়, ধরা পড়ে মানুষেরও মধ্যে, বিশেষত প্রকৃতিরূপিণী নারীর অবয়বে। অভিজ্ঞজনেরাই বলতে পারবেন, প্রসাধনচর্চিত ছিমছাম মুখশ্রীর চেয়ে তাপে আরক্ত ঘামে ভেজা আর ঈষৎ হাঁপিয়ে-ওঠা মুখের আকর্ষণ ঠিক কতোখানি বেশি।

৬

* * *

সে-সব দিন আর নেই।

তখন মেয়ে চোদ্দয় পা দিলেই গরজ বাড়ত মা-মাসীর ; বাড়িতে বয়স্কা বিধবা পিসী বা দিদিমা ঠাকুমা থাকলে চিন্তার ভার বহন করতেন তাঁরাই। বিয়ের চিন্তা। আগেকার সমাজচিত্রে বা গল্প উপন্যাসে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। কিছুদিনের মধ্যেই চিন্তাটা তোলা হতো বাড়ির যোগ্য পুরুষ বা পরিবারের কর্তার কানে। যাঁকে বলা হলো স্বভাব-লক্ষণে তিনি সরল বা গম্ভীর যে-কোনো প্রকৃতির হলেও নারীজনের পরামর্শে সায় না দিয়ে পারতেন না। ডাক পড়ত ঘটক-মশাইয়ের। ঘটকালির বিশালপর্বে তিনিই প্রথম অঙ্কের নায়ক।

বিশেষ বয়সে পৌছুনোর পর ছেলে বা মেয়ের শারীরিক লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হলেও, এবং পারস্পরিক বৈষম্য ও আকর্ষণ বিষয়ে প্রবণতা দেখা দিলেও 'জয় জগদম্বা' ব'লে পরস্পরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ তখন ছিল না। বাধা ছিল সামাজিক রীতি, বয়স্কদের কটাক্ষ ও দুর্নামের ভয়। পুরুষদের মধ্যে বীর ও নারীদের মধ্যে বীরাঙ্গনার দেখা মিললেও তাদের গুণপনা সীমাবদ্ধ থাকত প্রণয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে। প্রেম ছিল নিষিদ্ধ, প্রেমের অনুভূতিও। তবুও, দৈবাৎ প্রেমে-পড়া যুবক কবিতা লিখত এইভাবে—

'কুসুমলতা, কুসুমলতা, শুন সই—
তব মুখখানি দিবারজনী
চিঁড়া-দই।'

বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর হাতে চিঁড়া-দইয়ের সেই সংরক্ত আবেগ

পৌঁছুলে আড়ালে পুলকিত হতো সে, কিংবা ফেলত আবুককম্পিত দীর্ঘশ্বাস। ধরা পড়লে? দীর্ঘশ্বাস পরিণত হতো তর্জনে, এমনকি আত্মরক্ষার তাগিদে প্রেমিকের উদ্দেশে 'মুখপোড়া' বা 'মিন্‌সে' জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগেও দেরি হতো না।

এ হলো সেই সময়ের কথা, যখন 'হাম দো হামারা দো'র উপলক্ষ নিয়ে ভাবেনি কেউ, নারী বা পুরষ কারুব কাছেই যৌনতা বা সেক্স বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু, বিয়ের পর ন মাস দশ দিন গেলে বউয়ের ছেলেপুলে না হ'লে অঙ্গন জুড়ে শুরু হয়ে যেত গুঞ্জন। মেয়েদের ছেলে হতো না, তারা পুত্র বা কন্যা 'সন্তানের জন্ম দান' করত। 'অরক্ষণীয়া' কথাটি ব্যবহার হতো ঘনঘন; যৌতুক নিয়ে এখনকার মতো কৌতুক বা খবরের কাগজে লেখালেখি হতো না। লোকে শরৎবাবুর দেবদাস পড়ত দেবদাস না হবার জন্যে। 'তোমাকেই দেবী বলে মানি—' নীল প্যাডের কাগজে বুদ্ধদেব বসু-পড়া প্রেমিকের কাতরোক্তি চালান হয়তো না কলেজযাত্রী প্রেমিকার ব্লাউজের ভাঁজে; এমন কি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অপঠিত। সদ্যবিবাহিতা বধূর মনে শাশুড়ী-ননদের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। আর, এইসব সামাজিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে নাটকের শুরুতেই যার আবির্ভাব ঘটত তিনি ঘটক। আজকের পরিভাষায় ম্যাচ-মেকার। হুঁকো গড়গড়ার আমল, নিতান্ত উন্নাসিক ভিন্ন সিগারেট স্পর্শে সাধারণ রুচি সায় দিত না। ফিলটার ও টোব্যাকোর যথাযথ মিশ্রণে মেড ফর ইচ আদার গোছের স্লোগান সুঠাম যুবকের গায়ে সুন্দরী যুবতীর নির্দ্বিধায় ঢলে-পড়া এবং এই দৃশ্য গোচরে ইতরজনের দীর্ঘশ্বাস ফেলা বা সিগারেট টান দেওয়ার সময় আসেনি!

ঘটকের চেহারার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ত তাঁর কোনো-না-কোনো শারীরিক বা আচরণের খুঁতে! কপালে আঁচিল, একটি চোখ ট্যারা, পা টেনে হাঁটা বা খনখনে গলা—এ-সবের মধ্যেই চিহ্নিত হতো তাঁদের প্রাথমিক বৈচিত্র্য। অর্থাৎ, তাঁরা ছিলেন অগতির

গতি—ভিলেনকে ত্রাতারূপে দর্শন করলে যা হয়। তাঁদের প্রায় সকলের হাতেই থাকত কাপড়ে ছ্যাতা-ধরা ছাতা, যার অর্থ, যোটক মেলানোর জন্যে বৃষ্টি বা রোদ্দুরে তাঁরা ঘোরাঘুরি করতেন প্রচুর! কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছে তাঁর আপ্যায়ন সম্মানিতের। ভূরিভোজন-পর্ব সমাধার পর পাত্রী বিষয়ে সম্যক অবগত হতেন তিনি, সংগ্রহ করতেন কন্যার ঠিকুজি-কুষ্ঠি। পাত্র-নির্বাচন বিষয়েও শুনতেন কিছু কিছু! বাধ্য পিতা যখন পরীক্ষার্থীর ভূমিকায় সদরে বসে ঘটকের সঙ্গে এ-সব আলোচনা চালাতেন, তখন পর্দার আড়ালে অন্তঃপুরিকাদের কান থাকত সজাগ। কর্তার ভুলো মন বেফাঁস কিছু কবুল করলে পরে তা সংশোধন করতেন কর্ত্রীরা।

সব কথার পর বিদায়-পর্ব। পান চিবুতে চিবুতে ঘটকমশাই বলতেন, 'তা মুখুজ্যে মশাই, খরচ করবেন কী-রকম? রাজযোটক তো এমনিতেই হয় না!' 'তা ঠিক—' মিনমিনে গলায় কর্তা বলতেন, 'যথাসাধ্য। খরচ তো করতেই হবে—।' তখন যেতে-যেতে ঘটক বলতেন, 'হেঁ-হেঁ, ভগবৎকৃপায় আপনার তো কম নেই! তা, এই অধমকেও মনে রাখবেন এট্টু—হেঁ-হেঁ, জামাই আপনার চমৎকারই হবে। নির্বন্ধ তো কম করলাম না, আমার ঘটকালি খারাপ হয়েছে কেউ বলতে পারবে না—হেঁ-হেঁ!'

ঘটকই যেখানে যোগাযোগের প্রধানতম সূত্র, সেখানে কন্যাদায়-গ্রস্তেরও হেঁ-হেঁ করা ছাড়া উপায় কী! রাজযোটক সৃষ্টিতে এই ঘটকের স্বারোপিত সুনামে সন্দেহ থাকলেও তিনিই যেহেতু পরম—সমালোচনা ও নিন্দার ব্যাপারটা তুলে রাখা হতো আড়ালের জন্যে। তারপর সবই ছেড়ে দেওয়া হতো ভাগ্যের ওপর। তুখোড় জ্যোতিষীর কন্যাও যেমন বিধবা হয়, তেমনি পাকা ঘটকের ঘটকালিও যে অব্যর্থ হবে তার কোনো মানে নেই। সব ঘটকালির ফলই যে অশুভ হতো তা নয়, বরং শুভর সংখ্যাই ছিল বেশী। অশুভের মধ্যে নাটকীয়তাও থাকত না সব ক্ষেত্রে। কথায় আছে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিনের

ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই কারও। ঘটকের ঘটকালিতে, বাপ-মায়ের দেখা-শোনার পর, কিংবা প্রেম করে—পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ ঘটানোর পদ্ধতি পালটালেও ভাগ্যের খুঁটি আজও নড়েনি এতোটুকু। প্রবাদের নেপোর মতো, ভালো হোক বা মন্দ, দইটুকু সে-ই মারে।

কিন্তু, ঘটকমশাই হেঁ-হেঁ করলেই যে মনোমতো পাত্রটি নির্বন্ধে ধরা পড়ত তা নয়। তাঁর কাজ পাত্রী ও পাত্র পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানো। তার পরেও আছে কনে দেখা ও নাকচ করা—এক দর্শনেই পাত্রী পছন্দ হয়ে চ'লে এলো গৃহবধূরূপে, এ-রকম বড়ো একটা হতো না, আজও হয় না। পাত্র ও পাত্র পক্ষের প্রেস্টিজ আছে, লোকেই বা বলবে কী! পাত্রীর চলনে-বলনে-গড়নে-ধরনে যে-কোনো একটি খুঁত পাওয়া যেতই! বা, এ-সব পরীক্ষায় পাস করলেও আটকাত দেনা-পাওনার হিসেবে। দেনা-পাওনায় মিটমাট হলেও অমিল হতো নমস্কারী, ননদ-পুঁটলির হিসেবে, জুতোর কাট বা ছাতার বাঁট নিয়ে, কিংবা বরযাত্রীর সংখ্যা নিয়ে। সাত মণ তেল পুড়লেই যে রাধা নাচবে, তার স্থিরতা কী! কিন্তু রাধা যতোক্ষণ না নাচে, সম্বন্ধ যতোক্ষণ পাকা না হয়, ততোক্ষণ ঘটকের কাজও শেষ হয় না। তিনি হাঁক ছাড়তেন বর ও কনে—দু' বাড়িতেই নেমন্তন্ন খেয়ে।

ঘটকালি এখনো আছে, তবে তার মূলে যে-ঘটক তাদের সংখ্যা গেছে কমে। ব্যক্তিগতভাবে কেউই বোধ হয় আর এটাকে পেশা বলে গ্রহণ করে না। শহরাঞ্চলে তো নয়ই। কারণ তিনটি। এক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেয়েদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার অর্জন; দুই, খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব; এবং তিন শিক্ষার প্রসার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে ও পুরুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটার সুযোগ বেড়ে যাওয়া।

সব মিলিয়ে ঘটকালির পেশাদারি দিকটাও গেছে চ'লে। এখন মেয়ের বিয়ে নিয়ে বাপ-মার ঘুম না-হওয়ার সমস্যা শহরে তো

নেই-ই, গভীর গ্রামেও যে কতোটা আছে তা গবেষণার বিষয়। তবে এরকম একটা সমস্যা যে অদূর অতীতে ছিল, তার কিছু কিছু আভাস এখনো পাওয়া যায় কোনো কোনো বাংলা গল্প-উপন্যাসে, কিংবা চলচ্চিত্রে—যেখানে প্রখরযৌবনা ও লাস্যময়ী রূপে পরিচিতা অভিনেত্রীও অরক্ষণীয়ার ভূমিকায় ছুটে আসেন তাঁর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভারাক্রান্ত মাথার ওপর হাতপাখার বাতাস ছড়াতে। চপলমতি দর্শকরা এ-সব দৃশ্যে সহানুভূতি বোধের পরিবর্তে সিটি বাজায়।

সমাজ যে একভাবে বদলেছে তা নয়, বদলেছে বহুভাবে। নিয়মিত বদলাচ্ছে আরও। প্রচলিত নিষেধ, নীতি, রীতির আগলও ভাঙছে ক্রমাগত। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে এ-তত্ত্ব আর তথ্য নেই ; মেয়েদের স্থান হেঁশেল—এটা যদিও যা কেউ শখ হিসেবে মেনে নেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে শর্ত হিসেবে মানবেন না কেউই। বরং মেয়েরা এখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কলেজে, অফিসে বা অন্য কোনো উপায়ের মধ্যে। আগে যে-বয়সে পৌঁছুলে মেয়েদের বিয়ের যুগ্যি ব'লে ধরে নেওয়া হতো এবং তাদের পাত্রস্থ করার জন্যে বাড়ত ঘটকালির তৎপরতা, সেই বয়সের মেয়েরা এখন রবিবার সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে, কিংবা টিকিট কাটতে যায় মর্নিং শো বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসার, কিংবা কাটায় শুয়ে, বসে, আড্ডা দিয়ে। কেউই আর অরক্ষণীয়া নয় এবং অনেকের ক্ষেত্রেই বিয়ে করা না-করাটা ইচ্ছাধীন। তাই, নিজে বিয়ে না করেও চাকুরিরতা পিসীমা বি-এ এম-এ পাঠরতা ভাইঝি'র বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন দাদার কাছে—'ছেলেটি ভালো, বুঝলে, আমাদের বাসবীর দেওর, বিদেশ থেকে ফিরে সদ্য অমুক কোম্পানীতে ঢুকেছে। শমিতার সঙ্গে দারুণ ম্যাচ হবে!' দাদা বলেন, 'বেশ তো, দ্যাখ। তবে শমির মতটাও একবার জেনে নে। তোর বৌদি বলছিল, ইদানীং একটি ছেলের সঙ্গে নাকি ওর বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে—'

বন্ধুতা, প্রেম, এবং তারপরে বিয়ে—ঘটকালির কদর ও গুরুত্ব

কমাতে অবাধ মেলামেশাও কম সাহায্য করেনি। আগেকার দিনে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের প্রথম দৃষ্টিধন্য হতো ঘটকালির ঘানিতে মণ মণ তেল বেরুনোর পর, উলুধ্বনির মধ্যে, শুভদৃষ্টির সময়ে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে না দৌড়ে যারা এখনো চন্দনচর্চিত হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে ওঠে, শুভদৃষ্টির লগ্ন তাদের ছুঁয়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেটা নিছক নিয়মরক্ষার খাতিরে। পলকপাতে পুলক জাগানোর জন্যে নয়। এখন, শহরে অন্তত, বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর মুখচেনা হওয়া প্রায় শর্তমূলক ; পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে যারা আরও একটু এগিয়ে তাদের মধ্যে সুখচেনা হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে ঘটকালির ঘট যে ভেঙে যাবে, বা হারাবে তার চকচকে উপস্থিতি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর, মেয়েকে কলেজে বা অফিসে পাঠিয়েও যে-সব বাপ-মা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না, তাঁরা খবরের কাগজে পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপন দেখে অদৃশ্য সৎপাত্রের উদ্দেশ্যে বক্স-নাম্বারের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে যাবেনই। উপযুক্ত পাত্রের বাপ-মা'ও বসে থাকবেন না, খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' কলাম লক্ষ ক'রে ঈষৎ নাক চুলকে তাঁরাও টেনে নেবেন কাগজ কলম। দৈবের যোগ থাকলে একদিন শুভক্ষণে উভয়-পক্ষের সাক্ষাৎ হবেই। আধুনিক মতে সেটাই ঘটকালি। সে-ঘটকালি শুভ হবে না অশুভ, তা নির্ভর করছে পাত্র-পাত্রীর ভাগ্যের ওপর।

কথা হলো, ভাগ্যকে পুরস্কৃত করার সুযোগ কেউ কখনো না পেলেও ভাগ্য অনেককেই পুরস্কৃত করে। পদ্ধতি যাই হোক, ঘটকালিতে জিতে যায় তারাই।

৭

* * *

সন ছেচল্লিশের কথা। দাঙ্গার বছর; নোয়াখালির বদলা নেওয়া শুরু হলো বিহারে। সত্য-বালকের চেতনায় একদিন ঝাঁকুনি লাগল হঠাৎ। ভাগলপুরে শহরের রাস্তা থেকে মুহূর্তে উবে গেল গাড়ি, স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের পথ থেকে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হ'লো মানুষ-জন। সেই প্রথম দেখলুম পুলিসের কাজ চৌরাস্তায় চৌকি দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়—ট্রাক ও জীপে করে তারা ক্রমাগত টহল দিচ্ছে শহর। ওরই মধ্যে উড়ে আসছে খুন-জখম-অগ্নিকাণ্ডের খবর। বড়োদের মুখ থমথমে। মান্যিগণ্যিরা জীপ হাঁকিয়ে ছুটছেন এর ওর খবর নিতে।

সন্ধ্যেকে দান ছেড়ে দেবার জন্যে সেদিন বিকেল হয়েছিল তাড়াতাড়ি। বাবার মুখ ভার। ক্রমাগত ঘরবার করছেন আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন গোয়ালের দিকে। আমাদের দুই গুরুর নাম লক্ষ্মী ও পিয়ারী। শীঘ্রি বাচ্চা হবে বলে লক্ষ্মী গোয়ালে বাঁধা, কিন্তু পিয়ারী সেই যে চরতে বেরিয়েছে সকালে, ফেরেনি তখনো। অবোধ জীব, তেঁতো না লাগা পর্যন্ত ঘাস থেকে মুখ তোলে না। হিংসা টের পায়নি।

পঞ্চাননদাকে ডাকলেন বাবা, 'মুশকিলে পড়া গেল! কী করা যায় বলো তো!' মাসখানেক আগেই ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে কাঠবাঙাল পঞ্চাননদা কাজে লেগেছে আমাদের বাড়িতে। ঢ্যাঙা চেহারার তেড়িয়া মানুষ, হাওয়ায় টান ধরলেই ফুঁ দেয় বাঁশের

বাঁশিতে, নদী ছাড়াই গেয়ে যায় ভাটিয়ালী। সঙ্গী এক তেল চকচকে লাঠি। বলল, 'আমি যাই বাবু খুঁজে আনি। গরুর প্রাণ আগে।' কোমরে ধুতিটা জড়িয়ে নিল ফেতভা দিয়ে। আধ ঘণ্টাটাক পরে দেখা গেল শূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে ল্যাজ তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে পিয়ারী, পিছনে লাঠি উঁচিয়ে পঞ্চাননদা।

আমাদের বাড়ির পিছনে শের শাহের আমলের মসজিদ আর কবরখানা। এমনিতে স্তব্ধ, সেদিন সন্ধ্যে হতে না হতেই মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জড়ো হতে লাগল শড়কি, টাঙ্গি ও বল্লমের ছায়া। মাঝখানে ব্যবধান শুধু আটফুট পাঁচিলের!

জীপ নিয়ে ছুটে এলেন বিরোবাবু—'ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চটপট উঠে এসো সকলকে নিয়ে।'

বাবা বললেন, 'গরুগুলোর কী হবে!'

'আগে নিজেরা বাঁচো, তারপর গরু। কাল যা হোক করা যাবে।'

খুব দূরে নয়, শেষপর্যন্ত ঠিক হলো রাস্তার ওদিকে উকিলবাবুর বাড়িতে রাত কাটাতে যাব আমরা। উকিলবাবুব এক ছেলে শার্প-শুটার। আগলে নিয়ে যাবার জন্যে সে ছুটে এলো তাড়াতাড়ি।

বেঁকে বসল পঞ্চাননদা।

'আপনারা যান। আমার একটাই প্রাণ; তিনকুলে কেউ নাই। গেলে কেউ টের পাবে না। গরুগুলোকে কে দেখবে!

যুক্তি দিয়ে নড়ানো গেল না তাকে। কালো চকচকে মুখে হাসি ফুটিয়ে খিল তুলে দিল দরজায়।

ও-রকম আশঙ্কার রাত আর কখনো আসেনি। আমরা একা নয়; আশপাশের আরও তিনটি পরিবার এসে জুটেছে সেখানে। প্রাণ বাঁচলেও ঘরবাড়ি যে পুড়বে না, লুট যে হবে না, তার ঠিক কী। চুপচাপ থেকে ভিতরে ভিতরে অনেকেই চ'লে যাচ্ছে অনেকদূর পর্যন্ত। ওরই মধ্যে পুরুষরা তৈরি হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্যে—কাঁধে

টোটা ভর্তি বন্দুক ঝুলিয়ে চোয়াল শক্ত ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে উকিলবাবুর ছুই ছেলে। বড়োরা নিরস্ত্র। আমরা, ছোটরা একজোট হয়ে চিবোচ্ছি ভিজে চিঁড়ে আর গুড়। এমন সময় নিশুতি চিরে ভেসে এলো 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি। পর পরই 'বন্দে মাতরম্'। গোলমাল প্রত্যক্ষ হ'তে পড়ি-কি-মরি ক'রে সবাই ছুটল ছাদে।

সর্বত্র জুড়ে কার্ফুর অন্ধকার। শুধু আকাশে চটচট করছে তারাগুলো। দক্ষিণে অনেকটা আকাশ জুড়ে গনগনে লাল ; মনে হলো একটা গোটা এলাকা জ্বলছে আগুনে। তারই আভায় চেনা যায় আমাদের বাড়িটা, ছাদটা। দূরের চাপা কোলাহল আড়াল ক'রে এক গান ভেসে এলো আমাদের কানে—'আকাশ থেকে তারা নেমে আয়, বেঁধে দেব চুল…'। সুরটা স্পষ্ট হ'তেই ছায়ার মতো শরীরটাও চোখে পড়ল। লাঠি হাতে ছাদে পায়চারি করছে পঞ্চাননদা। মাঝে-মাঝে গাইছে গলা ছেড়ে। মাঝে-মাঝে এলোমেলো ফুঁ দিচ্ছে বাঁশিতে। সেই মুহূর্তের আশঙ্কা ভুলে সবাই তাকিয়ে থাকল আমাদের ছাদের দিকে। রকমসকম দেখে মনে হয় না চারিদিক মেতে উঠেছে হত্যাযজ্ঞে।

পরের দিন সকালে লালচে ঘোরলাগা চোখে দরজা খুলে দিল পঞ্চাননদা। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'অমন পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছিলে কেন ?'

'কী করব বাবু! ভয় লেগেছিল।' কাঁচুমাচু গলায় বলল পঞ্চাননদা, 'ওই গান আমার বাপের শেখানো। ভয় পেলে গাইতাম। তা একখানি রাত গেছে বটে!'

৮

* * *

লুকিয়ে প্রেম করার পর্বে প্রেমিকাকে আবিষ্কার করার পরই যাকে আবিষ্কার করতে হয় তিনি প্রেমিকার বাবা। যাদের উৎসাহ আরও একটু তৎপর, তারা অবশ্য পূর্বরাগ পর্বেই তাঁকে ভাবতে শুরু করে নিজের বাবা বলে। অভ্যর্থনার জন্যে সারাক্ষণ বুকের মধ্যে গুটিয়ে রাখে রেড কার্পেট।

বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা। ডবল-ডেকারের প্রায়-ফাঁকা দোতলায় একটি সীট দখল ক'রে চলেছি বিকেলে তার সঙ্গে দেখা হবার সুখজড়িত ভাবনা নিয়ে। এমনই স্বপ্নময় ভ্রমণ যে বাস কোথায় থামল না থামল, কে উঠল না উঠল, তা নিয়ে নেই সামান্য মাথাব্যথা। হঠাৎ গায়ের ওপর কেউ এসে পড়তে ধ্যানভঙ্গ হলো। বিরক্তিতে চোখ ফেরাতেই দেখি, তিনি। পাশের খালি সীটটি দখল করেছেন এমনভাবে, যা প্রায় জবরদখল করারই মতো। না-চেনা আমাকে আপ্যায়িত করার গলায় বললেন, 'লাগল নাকি?'

কী জবাব দেওয়া যেতে পারে ভাবতে ভাবতে উত্তরটা গিলে ফেললাম। মাথায় টুপি ও পায়ে মোজা, আদ্যন্ত শীতের পোশাক তাঁর গায়ে, নিপুণ কামানো গাল ও ভুরুর কাঁচাপাকা চুল ছুঁয়ে উড়ছে আফটার-শেভ লোসনের গন্ধ—শীত পুরোপুরি না পড়তেই শীতের ভেট বলতে যা বোঝায়।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বললেন, 'যা ঝাঁকুনি আজকালকার বাসে! কাগজে লিখেছে সত্তরটা নতুন বাস ছাড়া হবে শীঘ্রি, সেগুলো এলে বোঝা যাবে।'

নতুন বাসে ঝাঁকুনি কম হবে কিনা আমার জানা নেই। কাঠ হয়ে বসে থাকলাম।

পরের প্রশ্ন: 'ক'টা বাজে?'

বললাম, 'এগারোটা—'

ভদ্রলোক তাকালেন নিজের রিস্টওয়াচের দিকে।

'পাঁচ মিনিট ফাস্ট যাচ্ছে। আপনার·টাইম ঠিক তো?'

জবাব না দিয়ে অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। যাব চৌরঙ্গি পর্যন্ত। তিনি কতোদূর, জানা নেই।

হঠাৎ শুনি ব্যস্তভাবে চ্যাঁচাতে শুরু করেছেন, 'কণ্ডাক্টর! কণ্ডাক্টর!'

বাসসুদ্ধ লোককে সচকিত ক'রে তড়িঘড়ি ছুটে এলো কণ্ডাক্টর। পর্বতের মূষিক প্রসবের গলায় হাস্যবিগলিত তিনি বললেন, 'টিকিটটা কাটবে তো?'

'ও, টিকিট।' কণ্ডাক্টর বিরক্তি লুকালো, 'এতো ব্যস্ত হবার কী আছে!'

'ব্যস্ত হবো না! কাগজে ছাখোনি, টিকিট না কাটার জন্যে সবকারকে ফি-বছর লোকসান দিতে হয় কতো!'

বাসসুদ্ধ লোক তখন ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে। অনেকেই হাসছে মিটিমিটি—যেন এমন কৌতুককর উপলক্ষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

কেন জানিনা, রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। অন্য কোনো উপায় না-পেয়ে দ্রুত উঠে নেমে পড়লাম বাস থেকে, গন্তব্যে পৌঁছুবার আগেই।

রাগটা থেকে গেল। ইচ্ছে করেই সেদিন সান্ধ্য-সাক্ষাতের সময় পার ক'রে চুপচাপ বসে থাকলাম অফিসে। দিব্যচোখে দেখছি হাওয়ায় উড়ন্ত তার শাড়ির আঁচল, সে আসছে। তারপর নির্দিষ্ট বাসস্টপে দাঁড়িয়ে তার অস্বস্তি-মেশানো অপেক্ষা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফোন এলো।

'কী ব্যাপার! আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে অফিসে!'

কোনো কৈফিয়তে গেলাম না। বললাম, 'তোমার বাবা যদি পথেঘাটে কথা বলা না কমান, তাহলে আমার পক্ষে আর এগনো সম্ভব হবে না।'

স্তম্ভিত সে, বলল, 'বাবা! বাবা এর মধ্যে আসে কোত্থেকে!'

তখনো রাগানুরঞ্জিত আমি, বললাম, 'আসে'।

৯

* * *

আমার ছ' বছরের ছেলে সম্প্রতি খবরের কাগজ পড়তে শিখেছে। বড়ো মধুর এই শিশুকাল, যখন যেটায় চোখ পড়ে সেটাই কেড়ে নেয় মন। কিছুকাল আগে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি দু'অক্ষরের শব্দ—বাঘ—হঠাৎই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার। ছবিহীন সেই শব্দরহস্যের তাকে আকর্ষণ করার কথা নয়, তবু কী জানি কেন প্রথমবার এড়িয়ে গিয়েও সে আবার ফিরে এসেছিল, আর ফেরেনি।

তখনো অধরা এই বাঘটির নাম সুন্দরী, ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছিল নরখাদিকা হিসেবে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, ভয়ঙ্কর অরণ্যের এই দুর্দান্ত জীবটিকে না-মেরে মারবার জন্যে তখন কিছুদিনের জন্যে খবরের কাগজের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে নেচে বেড়াতো কালো কালো ক্ষুদে অক্ষরগুলো। দুর্বোধ্য আকর্ষণে শিশুটির চোখও নির্দ্বিধায় অনুসরণ ক'রে যেত তাকে: প্রতিদিন সকালে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হতুম আমি। তারপর তো ধরা পড়ল সেই—বাঘিনী নয়—বাঘ। খাঁচায় পুরে স্টীমারে চড়িয়ে মুমূর্ষু প্রাণীটিকে ছেড়ে দিয়ে আসা হলো সেইখানে, বন্যরা যেখানে সুন্দর।

থাকি একতলা বাড়িতে। আমার ভাগ্যে কাগজ পাই খুব সকালে। বসার ঘরের জানলার খড়খড়ি তোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ঠকাস্ শব্দ—কাগজ দিয়ে গেল—ওই শব্দে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায় আমার। কখনো সঙ্গে সঙ্গে উঠি, কখনো বা থেমে থাকি

আলস্যে। হঠাৎ একদিন লক্ষ করলুম অভ্যাসটি আমার পুত্রের মধ্যেও বর্তেছে, আমি বিছানা ছেড়ে বসার ঘরে আসতে না আসতেই ঘুমচোখ রগড়াতে রগড়াতে সেও এগিয়ে আসে দিব্যি। তারপরেই ভারিক্কি চালে হাত বাড়ায় বাংলা কাগজটির দিকে। বাঘ তার প্রিয় প্রসঙ্গ, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার বিবরণ, আছে গাভাসকার, বিশ্বনাথ, ব্রিজেশ প্যাটেলের ব্যাটিং দৌরাত্ম্যও। এইভাবে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, বাংলা কাগজটির উপর গৃহস্থের প্রাথমিক অধিকার চ'লে গেল তার দখলে।

ক্রমাগত ক'দিন অনিদ্রায় ভোগার পর সেদিন শুয়েছিলুম ঘুমের বড়ি খেয়ে। স্বভাবতই টান ধরেছিল চোখে। ঘুম ভাঙল ছেলের টানাটানি আর ডাকাডাকিতে—'ও বাবা, শীগ্‌গীর এসো না, ছ্যাখো কী হয়েছে!' খুব স্বাভাবিক নয় সেই স্বর, আচ্ছন্নতার মধ্যেই টের পেলুম তা। ফলে উঠতে হলো।

সে বলল, 'বাঘটা মরে গেছে!'

কাগজে চোখ বুলিয়ে দেখলুম ঠিকই। বললুম, 'তাইতো।' সে বলল, 'ইস্! শুধু শুধু বেচারাকে বন্দুক দিয়ে মারতে গেল কেন।'

প্রশ্নটা সহজ নয়। বিশেষত যে-সুরে করা হলো—শিশুকণ্ঠের সেই বিষাদ উত্তরযোগ্য নয়। এড়িয়ে যাবার ছলে বললুম, 'তাতে কী! আরও বাঘ আছে। আবার একদিন তোমায় চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব।'

যেমন তেমন ক'রে মিটে গেল ব্যাপারটা। কাগজ পড়েই এখন সে লয়েড কালিচরণ আর গ্রীনিজের নাম জেনে গেছে। দুপুরে, আমি যখন বাড়িতে থাকি না, আর তার মা থাকে কাজে কিংবা ঘুমে, জন্মদিনে পাওয়া কাঠের ব্যাটটি নিয়ে বিষেণ্ সিং বেদীর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সহজেই তুলে নেয় তিন হাজার, চার হাজার রান, নিরানব্বুইয়ের মাথায় গাভাসকার হেন তুখোড় ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলেও আমি বাড়ি পেঁছুতে পেঁছুতে তার নিজস্ব রান সংখ্যা

পৌঁছে যায় সাত হাজারে। তাকে আউট করা যে সহজ নয় এটা তার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে প্রমাণ করে একটি মাত্র স্ট্রোকে সে সংগ্রহ করতে পারে নিদেন কুড়িটি রান। পরদিন সকালেই খোঁজ পড়ে কাগজে, কে কতো রান করল, কে 'বোগাস', কে 'এক্কেবারে যা তা।'

এইভাবেই চলছিল। সেদিন ছুটির দিন, সদ্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাগজটি হাতে টেনেছি, সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বাবা, মানুষ খুন করে কেন?'

অতর্কিত প্রশ্নে অল্প চিড় খেয়ে গেল ভিতরটা। এক মুহূর্ত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন?' সে বলল, 'এই তো, দ্যাখো না, বেরিয়েছে কাগজে।'

'হাবড়ায় জোড়া খুন।' চব্বিশ পয়েন্ট লাডলোয় ছাপা প্রথম পাতার সংবাদটিতে চোখ বোলাতেই হলো: মা ও মেয়ে খুন হয়েছে ছেলের হাতে, কারণ অজ্ঞাত, খুনী পলাতক। চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে কঠিন ও নির্বিকার আমাদের মন এ-সব খবরে তৃপ্ত হয় না আজকাল, অকিঞ্চিৎকর ভেবে এড়িয়েই যায়। কিন্তু শিশুটি সবেমাত্র অভ্যস্ত হ'তে শুরু করেছে অক্ষরে, পৃথিবীব্যাপী বহুতর শব্দের অর্থ এখনো পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি তার। এখনো তাকে যেতে হবে অনেকদূর এবং চিনে চিনে। এড়িয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি বললুম, 'ও কিছু নয়, তুমি কি জানো খুন করা কাকে বলে?'

সে বলল, 'হ্যাঁ। খুব জোরে মারলে রক্ত পড়ে, তখন মরে যায়।'

আলগোছে সংবাদটিতে আবার চোখ বুলিয়ে দেখলুম, ছোটো সংবাদের ভিতরেও লুকিয়ে আছে 'রক্ত' শব্দটি—'রক্তাপ্লুত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরের সময়' ইত্যাদি। তার সূত্রে ভুল নেই কোনো। খবরের কাগজ ছাড়াও নানান গল্পের বই এখন তার পড়ার আওতায়, হ'তে পারে এরই কোনোটি থেকে ইতিমধ্যে সে আহরণ

ক'রে নিয়েছে এই জ্ঞান। এমনও হ'তে পারে বিষয়টি জেনেছে স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পে ; আজকাল শিশুরা অনেক খবরই টের পায় আগেভাগে। তার সঙ্গে প্রতারণা করা ঠিক নয়। সে চুপ ক'রে আছে দেখে আমিও চ'লে গেলুম অন্য প্রসঙ্গে।

কিন্তু, ব্যাপারটি গেল না। এই বয়স পর্যন্ত অনেক খুনের বিবরণ পড়েছি আমি, শুনেওছি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কাউকে কখনো খুন হ'তে দেখিনি। বোধ হয় ভুল বলা হলো একটু। দেখেছিলুম একবার অনেকদিন আগে, আমার পুত্রের আজ যে-বয়স প্রায় সেই বয়সে। সবে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিহারের যে-শহরে আমরা ছিলুম সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে তার আগুন। আমাদের বাড়ির গায়েই ছিল কবরখানা আর মসজিদ; এই বাড়িতে আমাদের থাকা নিরাপদ নয় ভেবে শহরের মান্যগণ্যরা তুলে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি অন্যত্র, যেখান থেকে আমাদের বাড়িটা দেখা যায় স্পষ্ট। সবাই গেলুম, শুধু বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় থেকে গেল একজন: পঞ্চানন, যাকে আমরা ডাকতুম 'পঞ্চাননদা' ব'লে—আমাদের বাড়ির মাঝবয়েসী, টান-টান চেহারার পূর্ববঙ্গীয় গৃহভৃত্যটি। বলল হাতে লাঠি আছে বুকে ভগবান আছে, আমায় মারবে কে!

স্মৃতি ব'লে দেয় সে ছিল এক ভয়ঙ্কর সময়। সন্ধ্যে হতে না হ'তেই কার্ফুর ত্রিপল টেনে দেওয়া হতো চারিদিকে, ছড়িয়ে পড়ত স্তব্ধতা, আর রাত যতো গভীর হতো ততোই চতুর্দিক জুড়ে খান খান হতো কখনো 'বন্দে মাতরম্' কখনো 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি। বীভৎস চিৎকারে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসতুম। নিশুতি চিরে তখন একটি সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসত কখনো সখনো: 'আকাশ থেকে তারা নেমে আয়, বেঁধে দেব চুল···'। পঞ্চাননদার গলা বুঝতুম, ছাদে পায়চারি করতে করতে গেয়ে যাচ্ছে তার প্রিয়তম গ্রাম্য গানটি। বাবা বলতেন, ভয়ে ঘুমুতে পারছে না বেচারা!

বুকের ভিতর ভয় লুকিয়ে অন্যের ভয় অনুমান করার বয়স সেটা নয়। সকালে বড়োদের আলোচনা শুনে বুঝতুম, চারিদিকে চলেছে একটা রক্তকাণ্ড, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি। তখনকার অভিজ্ঞতায় সেগুলোই মনে হতো অসাধারণ রোমাঞ্চকর।

সেই পঞ্চাননদা খুন হলো একদিন। কে বা কারা খুন করল তাকে জানা গেল না—একদিন সকালে রাস্তায় পাওয়া গেল ধড়মুণ্ড আলাদা করা তার দেহটি। পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার আগে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে আমিও এক পলক দেখেছিলুম সেই বিচ্ছিন্ন দেহ। কিছু মায়া হয়েছিল, বিপরীতগামী দুই সাম্প্রদায়িক ধ্বনির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একটি গ্রাম্য গানের কথা মনে পড়ত কিছুদিন। তার বেশী কিছু হয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। অন্তত, মানুষ খুন করে কেন, সেদিন বা তারপরেও কোনোদিন এই প্রশ্নের উদয় হয়নি মনে।

আজ হলো। আজ একটি শিশুর প্রশ্ন স্পষ্টই ছুঁয়ে গেল আমাকে। যে-কোনো কাজ ও প্রসঙ্গের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আমি তার প্রত্যক্ষ জিজ্ঞাসা অনুভব করি।

আমার অধ্যাপক বন্ধুটি মনস্তাত্ত্বিক এবং কৃতী; মনুষ্যচরিত্রের বিভিন্ন বিভঙ্গ বিষয়ে তার অনেকানেক বিশ্লেষণ ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রশস্তি অর্জন করেছে। সেদিন তার সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রশ্নটি উত্থাপন করলুম আমি—মানুষ খুন করে কেন? বিহ্বল দৃষ্টিপাতেই সে বুঝিয়ে দিল প্রশ্নটি সহজ নয়; সুতরাং উত্তরও। তারপর ভেবে বলল, খুন চার রকমের হয়: (১) মোটিভেটেড, (২) ইন্‌স্‌টিনক্‌টিভ, (৩) ইম্‌পাল্‌সিভ', (৪) অ্যাক্সিডেন্টাল। এই চারটির যে-কোনো একটির প্রভাবেই মানুষ খুন করতে পারে। তবে গণহত্যা বা ব্যক্তিহত্যা যে-কোনো ধরনের খুনই হোক না কেন, খুনের ইতিহাসে প্রায় নব্বুই ভাগই পড়ে প্রথম ধরনের মধ্যে—যেখানে যে খুন করবে ও যে খুন হবে উভয়ের মধ্যে আছে একটা পরিষ্কার স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এমন কোনো উদ্দেশ্য পূরণের বিষয়—যা সংঘটিত না হ'লে একটি

স্বার্থের সম্ভাব্য অপচয় ঘটে। এ উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হ'তে পারে, হ'তে পারে সামাজিক বা অন্য কোনো ধরনের। হিটলারের সহযোগীরা যখন লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিল, তার পিছনে ছিল একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, গোটা একটি সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের চক্রান্ত। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত খুনের ক্ষেত্রেও প্রায়ই থাকে একটা-না-একটা উদ্দেশ্য। অসুবিধে হলো সেইগুলি নিয়ে যেখানে কার্য-কারণের কোনো সম্পর্ক খুঁজে বের করা যায় না।

একটু হাসি ছুঁয়ে গেল বন্ধুর বিকল্প মুখে: সংসারে এমন বহু নিষ্পাপ, নির্বিরোধী, শান্ত স্বভাবের মানুষ থাকে, যারা আসলে খুনী, অর্থাৎ, যাদের রক্তে আছে হত্যার প্ররোচনা—নিশ্চুপভাবে সারা জীবনের সমস্ত মূর্তিটির ভিতরে তারা পুষে বেড়ায় একজন খুনীকে। শত ভালো কাজ ক'রেও তারা তৃপ্ত হ'তে পারে না, যতোক্ষণ না তাদের হাতে সংঘটিত হচ্ছে—যতোই নিন্দনীয় হোক—একটি পরিচ্ছন্ন খুন। আবার এমনও অনেক নজির পাওয়া যেতে পারে যেখানে উদ্দেশ্য বা প্ররোচনা ছাড়াই একজন খুন করতে পারে আরেকজনকে। এ-সব ক্ষেত্রে খুনীরা খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রায় সিকি-সেকেণ্ডের মধ্যে এবং হঠাৎ কোনো পূর্ব-প্রসঙ্গ ছাড়াই—খেতে খেতে, গল্প করতে করতে, ঘুমের মধ্যে, এমনকি রতিক্রীড়ার মধ্যেও। এ-এক অদ্ভুত মানসিকতা: যখনই কারুর মধ্যে উদয় হয় তাকে আর নিরস্ত করা কঠিন। প্রবলযৌবনা, সুন্দরী প্রেমিকাকে চুম্বন করতে করতে তার কণ্ঠরোধ করেছেন দশ আঙুলের নিষ্পেষণে, এমন একজন প্রেমিকের কথা আমরা জানি। খুনী এই প্রেমিকটি পরে স্বীকার করে, চূড়ান্ত তৃপ্তি উপলব্ধির জন্যেই সেই মুহূর্তে সে প্রেমিকাকে খুন করা সাব্যস্ত করেছিল। পরে অবশ্য খুবই অনুতপ্ত হয়। কিন্তু, অনুতাপ খুনীদের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নয়—যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে খুনীরা অন্তত তার জীবনকে মূল্য দিতে জানে না।

এ-সব ছাড়াও, বন্ধু বললেন, আছে আরও এক ধরনের খুন, যা একেবারেই দুর্ঘটনার শামিল। মনস্তাত্ত্বিকেরা এই ধরনটিকে ঠিক খুনের পর্যায়ে ফেলেন না। ধরো কারুর সঙ্গে জোর রাগারাগি হচ্ছে তোমার : তোমার হাতের কাছে আছে একটা পেপারওয়েট, রাগের মাথায় তুমি ছুঁড়ে মারলে সেটা—সেটি গিয়ে লাগল লোকটির কপালে ; সে খুন হলো। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাগ প্রকাশের একটি উপলক্ষ, খুন করা নয়। এ-ক্ষেত্রে খুনটা একেবারেই দুর্ঘটনা—প্রমাণ করা দুরূহ হলেও দুঁদে ব্যারিস্টার অনেক দাগী খুনীকেও 'দুর্ঘটনা' প্রমাণ ক'রে ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে আনতে পারেন।

কিছু জ্ঞান অর্জন করা হলো। কিন্তু অন্যমনস্কতার মধ্যেও যে-কথাটি বন্ধুকে বলতে পারলুম না, তা হলো এগুলো খুনের প্রকৃতিগত বিচারমাত্র, আমার প্রশ্নের জবাব নয়। প্রশ্নটা আমারও নয়, একটি অবোধ শিশুর—উদ্দেশ্য, অনুভূতি প্ররোচনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি শব্দগুলি ও তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সঙ্গে পরিচিত হ'তে যার সময় লাগবে এখনো অনেকদিন। ততোদিনে 'মানুষ খুন করে কেন ?' এই সাদামাটা প্রশ্নটির ভিতরের দুঃখ তাকে শুকিয়ে দিতে পারে।

মনে হয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াও আর কোথাও আছে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর, যা উচ্চারিত হ'লে সমগ্র মানবসমাজই আর-একটু বেশী সভ্যতায় উন্নীত হবে ; এমনকি মানুষের গুপ্ত আচরণবিধি থেকে একটি সংজ্ঞা চিরকালের জন্যে লুপ্তও হ'তে পারে। এমনও মনে হয়, এর চাবিকাঠি মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, চিকিৎসক বা রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। এর উত্তর দিতে পারেন শুধু তাঁরাই, যাঁরা—যে-কোনো প্রবৃত্তির জন্যেই হোক - একবার না একবার খুন করেছেন। যে-পৃথিবীতে এখন চীন ও আমেরিকা বিনিময় করছেন প্রত্যক্ষ সৌহার্দ্য, এর হার্ট জুড়ে দেওয়া হচ্ছে ওর হার্টে—এবং জীবনদানেরই জন্যে, সেখানে জনগণমঙ্গলের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খুনীদের একটি সম্মেলন ডেকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা কি খুবই অসম্ভব প্রস্তাব ?

১০

* * *

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি—', এটা বোধ হয় নিছক কবি-কল্পনা ; আমাদের ছোটবেলায় অন্তত ছুটি কখনো এভাবে আসেনি। বাদল টুটির ঘটনা এক হিসেবে ছিল যন্ত্রণা। রেনি-ডে'র সম্ভাবনা স্কুল না-যাওয়ার যে-আমোদ সৃষ্টি করত মনে, মেঘের কোলে রোদের দেখা মেলা মাত্রই তার আবেগ যেত টুটে।

ছুটি বলতে রবিবার। রুটিনের ঘরে ফাঁকা থাকত বলেই নয় ; সে আসত মাংসের গন্ধে রসনা আপ্লুত ক'রে।

আমার মতো যাদের ছোটবেলা কেটেছে দূরে মফঃস্বল শহরে— যাঁদের ছুটির দিনের আনন্দ উপভোগ করার উপকরণ কোনোদিনই রোদ্দুরে (যদি থাকে) গা-হাত-পা মেলে ধরার বেশি এগোয়নি এবং যাঁরা বাঙালের হাইকোর্ট দেখার উপমায় চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বটানিকাল গার্ডেন থেকে মর্নিং শো অব্দি সবকিছুরই সংস্পর্শে এসেছেন একটু বেশি বয়সে, আজ অতীতে ফিরে গেলে তাঁরা সকলেই হয়তো রবিবার বলতে মাংস রান্নার গন্ধ খুঁজে পাবেন। হলুদমাখা সেই চমৎকার গন্ধের চকিত আবির্ভাবে অর্ধেক ভোজন সমাপ্ত হলেও, রবিবার বুঝি পেটের খোলও দিত বাড়িয়ে— অনুতাপের সুযোগ ছিল না। নিরামিষের সঙ্গে আমিষের এমন সহোদরভাব খুঁজলে আর একটিও পাওয়া যাবে না।

তখনকার রবিবার বলতে আর মনে পড়ে চক সাহেবের কথা।

একটা সময় ছিল `যখন ক্রিশ্চান মিশনারী স্কুলের এই শুভ্রদর্শন প্রিন্সিপাল রবিবার হলেই অলক্ষ্যে আমাদের ডাক দিতেন শহর-ছাড়ানো তাঁর গাছগাছালি ঘেরা বাংলোয়—ঘরের বাইরের আঙিনাই যাদের বিদেশ, সেইরকম কয়েকটি বালককে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন তাঁর বিপুল সঞ্চয়, দেশবিদেশের রঙীন ডাকটিকিট। এমনকি মানচিত্রেও না-দেখা তার অনেকগুলি দেশে কোনোদিন হয়তো যাব আমরা—স্নেহশীল ক্রিশ্চান পাদরির মুখে ভাঙা বাংলায় এ-আশ্বাসও পেতুম। চাপা দীর্ঘশ্বাস মেশানো এ-সব স্মৃতির কোথাও লুকিয়ে থাকে ধারাবাহিক মিথ্যাভাষণ। নিজের কোথাও যাওয়া হলো না হলো সেটা বড়ো কথা নয় ; এখন রবিবারে সময় পেলে যখন ছেলেকে কাছে নিয়ে বসি, একই আশ্বাসে তার মনও কি ভরিয়ে তুলি না আমি ?

তখন ছিলুম ছোট। তারপর বয়স যখন বারো পেরুল, বুঝলুম আড্ডাই শ্রেয়। বন্ধুতার গণ্ডি ততোদিনে বিস্তৃত হয়েছে আরও, বেড়েছে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও শরীর ভেদাভেদের তৃষ্ণা। পরচর্চা —বাঙালী হয়ে জন্মানোর যেটা অন্যতম আকর্ষণ, সেই বয়সে আমার মতো আরও অনেকেরই আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়েছিল ওই রবিবারেরই কল্যাণে। আমাদের স্কুলের ষণ্ডামার্কা ড্রিলস্যার যে লুকিয়ে প্রেম করেন এক ক্ষীণতনু প্রতিবেশিনীর সঙ্গে এবং আমাদেরই একজনের মারফত চালান করেন প্রেমপত্র এ-সব জানানোর জন্যেও দায়ী রবিবার। সোম থেকে শনি তাঁর ষণ্ডপ্রকৃতি তটস্থ ক'রে রাখত ভয়ে।

রবিবার আর কিছু পারুক না-পারুক, পারে উসকানি দিতে। যুবক বয়সে অন্তত পারে জাগিয়ে তুলতে দূরকে নিকট করার অদম্য আবেগ। খিদে ও শীতের তাপ নিয়ে প্রেমের আবির্ভাবও এই সময়ে। এই বিরাট কলকাতা শহরের ব্যস্ত জনারণ্য শহর ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ে শহরতলিতেও—ভ্রূকুঞ্চনে অস্বস্তি নেই তার, বিরাম নেই

চোখ ঠারার। আজও, যুগলের জন্যে নিভৃতি—সে তো রবিবারেরই দান। একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বেরিয়ে পড়লেই হলো। এই একটি দিনেই—নাকি দুপুরে?—চারিদিকের পৃথিবী ও মানুষজন পরে নেয় উদারতার সাজ ; উদ্বাস্তুও বুঝি ছেড়ে দেয় দখল করা জমি। বাস-ট্রাম-ট্রেনের কথা বাদই দিলুম, এতো ফাঁকা চারিদিক, বস্তুত, বিশ্বাসই করা যায় না। হাওয়াও শিখে নেয় আচরণ। দশ কি বারো বছর আগে রবিবারের হাওয়া কী অসম্ভব মিশুকে ছিল ; আজও তা বলতে পারি অনুভূতি ছুঁয়ে, এই উত্তীর্ণ মধ্য-তিরিশেও। আজকের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয়, রবিবার তোমাদের ভরিয়ে দেয় না ভালোবাসায়? শহরতলির ট্রেনে চড়ে তোমরাও কি বেরিয়ে পড়ো না জোড়ে, দূরে—ডায়মণ্ড-হারবার কি বজবজের দিকে? স্টেশন থেকে বেরিয়ে দয়ালু রিকশা-ওয়ালার ডাকে ওঠো না কি সেই সীমিত-পরিসর যানে—যে তোমাদের নিয়ে যাবে দু' ধারে ধানক্ষেতের মাঝখানে মেঠো পথের ওপর দিয়ে! অনুভব ক'রো নাকি আঙুলের ডগায় কিংবা ঠোঁটের আগায় নিঃশব্দে উঠে আসা রবিবারের রক্তের চাঞ্চল্য।

দেখতে দেখতে বয়স গেল বেড়ে। একটা বড়ো উপন্যাসের মাঝখানের চ্যাপ্টারের প্রথম লাইনের মতো এখন অভিজ্ঞতার শুরু হয় 'দিন কাটিতেছে' ব'লে। স্ত্রী, পুত্র, সংসার, চাকরি—অনিশ্চয়ের ভাবনা নিয়ে। রবিবার এখনো আছে, কিন্তু তার রূপ গেছে বদলে। সিঁথিতে নেই সিঁদুর। পেঁয়াজ-রসুনের সংস্পর্শ এড়িয়ে তার বৈধব্য শুধুই চায় কোনোরকমে বেঁচে থাকতে—সোম থেকে শনির সংসারে, এক কোণে।

তবু সোম থেকে শনির খুঁটিতে বাঁধা কর্মব্যস্ত যে-জীবন, আজও তাকে কোল দিয়ে যাচ্ছে রবিবারই। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত যে-আমি সক্রিয়, ধোপদুরস্ত পোশাকে ও চকচকে বুলিতে সারাক্ষণ হয়ে থাকি টান-টান, ভোরে ওঠার জন্যে শোবার আগে

অ্যালার্ম দিয়ে রাখি ঘড়িতে—শনিবারের রাত তাকে মনে পড়িয়ে দেয় কাল রবিবার—ছুটি। হাত ভুলে যায় অ্যালার্মে মোচড় দিতে। বলব না ভেবেও স্ত্রীকে বলি, 'কাল একটু ঘুমুবো। উঠিও না।'

রবিবার বার দশেক তাগাদার পর অবশেষে যখন উঠি, তখনো কাটতে চায় না ঘুমঘোর। রয়েসয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বা খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে চোখ যার পরিচ্ছন্ন রোদ্দুরে, কান থাকে সংলাপে—'একটা দিনও বাজার না গেলে কি ক'রে হয়!' 'অমুকের হার্ট-অ্যাটাক হলো, একদিনও দেখতে গেলে না!', 'মা'র চিঠি এসেছে অনেকদিন, আজ জবাব দিও—।'

অনুযোগ একটা নয়, অনেক। একবার শুরু হলেই এসে পড়ে পর পর; হিসেব-নিকেশের ভারে পেয়ে বসে আলস্য। চোখের কোণও কি ভিজে ওঠে না কখনো। মনে হয় না, অনেক কিছুই করার ছিল, অনেকের জন্যে।

এখন রবিবার মানেই তো নিজের দিকে ফেরা।

১১

* * *

শীতের এক ধূসর সকালে মারা গিয়েছিল আমাদের শহরের অবনী মাস্টার। মোটা দশাসই কৃষ্ণবর্ণ ঘাড়ে-গর্দানে চেহারার এই মানুষটির শরীরে ও প্রাণে গান ভিন্ন আর কিছু ছিল না; লোভে ও দৈনন্দিন তৎপরতায় অন্ধ মানুষ কোনোদিন চেয়েও দেখত না তার দিকে। কিংবা দেখত তারাই, এ-সবের পরেও যাদের প্রাণে ছিল গানের জন্যে কোনো মায়া—সুরের প্রতি কোনো মোহ বা আকর্ষণ।

সেই দূর মফঃস্বল শহরে বড়ে গোলাম আলির পদধূলি পড়েনি কখনো, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ গণ্য হতেন শুধু হাতে-গোনা বড়লোক বাড়ির নৈশ আড্ডায়, খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কারো কারো উদাসীন চোখ জেনে নিত ডি ভি পালুসকর নামে কেউ মজলিশ জমিয়েছেন কলকাতায়। এই মানুষটি—অবনী মাস্টার—মনে হয় সে-সব খবরও রাখত না। বর্ষায় নদীর জল যেভাবে ভর করে স্খলিত উপত্যকায়, হঠাৎই অধিকার ক'রে নেয় তার সমগ্র মাটি, তেমনি হঠাৎ কোনোদিন গানের অন্তর্নিহিত রহস্য অধিকার ক'রে নিয়েছিল তাকে: আর ছেড়ে যায়নি।

আর এই রহস্য বা তার আচ্ছন্ন অবশ-করা শক্তির প্রকৃত রূপ, ধরা পড়ত শীত এলে। হিম হাওয়ার তাণ্ডবে ভোর-ভোর কুয়াশায় চারিদিক যখন স্তব্ধ, জেগে উঠবার আগে তবুও আর-একবার ঘুমে সংলগ্ন হ'তে চাইছে মানুষ, অতর্কিত হাওয়ায় নৈঃশব্দ্যের কাঠিন্য ভেঙে ছুটে আসত সুরেলা কণ্ঠের রাগালাপ—মধুর, বিলম্বিত

তানপুরার মূর্ছনায় আদৃত সেই কণ্ঠ ছড়িয়ে যেত দিকে দিকে। তখন সেই শব্দে কান পেতে, কেন যেন মনে হতো, অবনী মাস্টার নয়—তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত ওই অমল বাণী মরণশীল মানুষকে শেখাতে চাইছে অন্য কোনো সম্ভাবনার কথা; এই পৃথিবীর স্থূল দৈনন্দিনতায় আবদ্ধ মানুষের ক্লেদ-ক্লেশ-শূন্যতাময় স্মৃতি ও মননে যার রেশ নেই কোনো। শীতে অবরুদ্ধ বলেই মনে হতো এমন। এমনও মনে হতো, গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালীন আবহাওয়ার স্থিতি-স্থাপকতায় ওস্তাদ-কণ্ঠের ওজস্বিতা হয়তো ধরা দেবে, কিন্তু ধ্বনির অন্তর্নিহিত বাণী কি এতোদূর গভীরতা নিয়ে ধরা পড়বে এমন!

অবনী মাস্টার তার একার জীবন নিয়ে হঠাৎই একদিন চ'লে যায় পৃথিবী থেকে। মফঃস্বল শহরের এক অখ্যাত গায়কের নিঃশব্দ প্রস্থান কেউই লক্ষ করেনি তেমন, বড়ো দোতলা বাড়ির ছাদে টিনের ছাদ-অলা যে-ঘরে ব'সে চলত তার একাকী সুরস্বর্গে বিচরণ, অবনী মাস্টার মারা যাবার কিছুদিন পরে ধসে পড়ে সেটা—জায়গা ক'রে দেয় আরও একতলা কংক্রীটকে। তবুও, তারওপরে অনেকদিন পর্যন্ত শীতকালীন ভোরে হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখে বাইরে তাকালে কুয়াশায় জড়ানো চারিদিকের স্তব্ধতা থেকে হঠাৎই ভেসে আসত অবনী মাস্টারের গলা। অল্প ফাঁকা লাগত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তাম।

আমি গান বুঝি না। বুঝি না কোন সুরের কোন মীড়-গমক-মূর্ছনায় প্লাবিত হয় প্রকৃতি ও আবেগের রমস্যময় স্তরগুলি। সবদর্শী সরোদিয়ার দীর্ঘ মীড়গুলিতে নিঃসৃত হয় অবরোহী তীব্র মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদের যে-রস, বুঝি না কোন ভরসায় নিকটবর্তী হবো তার। তবু, গান গান-ই; সঙ্গীতের সাম্যবোধে ব্যাকরণবিদ ও নিরক্ষরের তারতম্য ঘুচে যায় একটিই টঙ্কার ও উচ্চারণে, যদি আকর্ষণ আর আগ্রহে খাদ থাকে না কোনো। সঙ্গীতের দুয়ারে তাই অভাজন বলতে কেউই প্রায় নেই—কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুনোর শর্তটুকু থাকলেই হলো, ধ্বনি তার অর্থময়তা পরিস্ফুট করবেই।

কিন্তু, শীতের সঙ্গে সঙ্গীতের কি সম্পর্ক আছে কোনো ? গভীর, গোপন কোনো সম্পর্ক—অন্তরীক্ষে থেকে যা ক্রমশ ও প্রবলভাবে আকর্ষণ ছড়াতে থাকে সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের মনে, ঘর ছেড়ে তাকে ডেকে আনে সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সান্নিধ্যে, আসরে ও জলসায়, অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষের ধ্বনিময় সমাবেশ। বিশেষ ক'রে শীত ঋতুতেই এতো যে সঙ্গীতের আসর, তা কি নিতান্তই নিরাপদ আবহাওয়ার কারণে, নাকি হিমেল হাওয়ার স্পর্শে কুঁকড়ে-ওঠা মানুষ তার দৈনন্দিনতায় আকীর্ণ সংস্পর্শ ও স্মৃতি থেকে ক্ষণিক মুক্তির জন্যে আড়াল খোঁজে এই সব আসরে— শুদ্ধতম ধ্বনির তাপে ক্লান্ত ফুসফুসে যৎসামান্য উত্তাপ সঞ্চারের জন্যে।

সাধারণ মানুষ অবশ্য শুদ্ধতার বিচার করে না ; সে শুধু ধ'রে রাখে নানা আবেশ-জড়ানো মুহূর্তের স্মৃতি। এই স্মৃতি দিয়ে সে যেমন মিলিয়ে নেয় বর্তমানের স্বর-সঙ্গতিকে, তেম'ন স্মৃতির মধ্যে দিয়েই ফিরে যেতে চায় কোনো হারানো অনুষঙ্গের দিকে ; একা দুঃখ পায় যে হারিয়ে গিয়েছে তার অভাবে। এই পাওয়া, হারানো ও আবার নতুন ক'রে পাওয়ার খেলা চলে সারা শীতকাল জুড়ে, এই কলকাতা শহরে ছোট বড়ো বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে। আলী আকবরের সরোদ শুনতে শুনতে বিরতির অবকাশে বেরিয়ে এসে, গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে মানুষ আলোচনা করে আলাউদ্দিনকে নিয়ে রবিশঙ্করের ঝনঝনার রেশ মেলাতে না মেলাতেই মেতে ওঠে কোনো নতুন বুধাদিত্য বা সুব্রতকে নিয়ে। এইরকম একটি আসরে গত বছর এক গভীর মধ্যরাতে অশীতিপর প্রায়-ন্যুব্জ এক বৃদ্ধকে বলতে শুনেছিলাম, ভাই রে, যতোই কও, বড়ো গোলাম আলী কি আর আইব ?

না, আইব না।

এই শীতেও গান বেজে উঠেছে কলকাতা জুড়ে। কিন্তু, অভাব সত্ত্বেও তাঁর প্রত্যাশা নিয়ে সেই বৃদ্ধটি এবারও আসবেন কিনা, তাও কি কেউ জানে ?

১২

* * *

ক্রিকেটের রিলে শুনব ব'লে সাত-সকালে ঘুমচোখে বোতাম টিপেছিলাম ট্রানজিসটরের। কানে এলো ভরাট গলার সম্ভাষণ, 'মাথা ধরেছে? ভাবনা কি—!' কাঁটা আছে ভুল মীটারে, বন্ধ ক'রে দিতে হলো। সকালের কাগজটা তুলে নিলাম হাতে। সুন্দর সপ্রতিভ চেহারার যুবতী হাঁটছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে—'মাসে তিরিশ দিনই এখন সে নিশ্চিন্ত!'

বিশ শতকের তিন-চতুর্থাংশ কেটে গেল। এই অব্দি পৌঁছে যখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবি, মনে হয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়েন ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যে-বিষয়টি আড়ালে কিন্তু স্বচ্ছন্দে বিস্তার করেছে তার বিপুল জাল, তা হলো বিজ্ঞাপন। এরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে আমরা উঠছি, বসছি, হচ্ছি প্রভাবান্বিত। কখনো বা বামনের ভূমিকায় থেকেও হাত বাড়াতে চাইছি চাঁদের দিকে! বংশানুক্রমিক, পারিবারিক, দেশজ বা সামাজিক, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের তোয়াক্কা না ক'রে ঢুকতে চাইছি সেই পরিবেশ, জীবন-যাপন পদ্ধতি বা স্টাইলের মধ্যে, যা, হয়তো, আমাদের চেনাবে নতুন ক'রে। নিজেদের চোখে তো বটেই, পরিচিত কিংবা অপরিচিত আর পাঁচজনের চোখেও।

অথচ, এটা যে আত্মিক কোনো পরিবর্তন নয়, পুরোটাই বাহ্যিক

·—সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। ইংরিজিতে যাকে বলে 'গ্ল্যামার' এবং সহজ বাংলায় 'চেকনাই', তার প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে না, পড়ে আমাদের বহিরঙ্গের ওপর। পড়ে সুখ, সমৃদ্ধি ও অহঙ্কার সম্পর্কে আমাদের ধারণার ওপর। প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে, এই ধারণাগুলিকে ক্রমাগত উস্‌কে দিচ্ছে বিজ্ঞাপন। তার প্রথম কাজ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনে অভাববোধ ও সেই সূত্রে চাহিদার সৃষ্টি, দ্বিতীয় কাজ দ্বিধা থেকে সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া, এবং তৃতীয়, সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করা। গোপনে ও ক্রমশ এই তিনস্তরিক রূপান্তর প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে ক্রেতা বা ভোক্তার মনে।

কৃষককে বলা হলো, মাঠে লাঙল চালিয়ে যে-ফসল পাচ্ছ তার চারগুণ পাবে, যদি ব্যবহার করো ট্রাকটর, বা অমুক মার্কা সার, বা পাম্পসেট। কৃষক ভাবল, তাই তো! চারগুণ ফসল মানে নতুন জীবন—আরও বেশী সুখ, আরও বেশী সাচ্ছল্য। তখনই শুরু হয়ে গেল তার প্রাণপণ পরিশ্রম। কিন্তু, সাচ্ছল্যই আকাঙ্ক্ষার শেষ কথা নয়। খবরের কাগজ বা রেডিও যেখানে পৌঁছুবে না, সেখানেও পৌঁছে যাবে ভাঙাচোরা, কাদামাটির রাস্তা ডিঙিয়ে মোবাইল ভ্যান সঙ্গে মাইক—হ-য-ব-র-ল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো তারস্বরে মন্ত্র পড়ে যাবে কানের কাছে, বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল? পণ্যের প্রস্তুতকারকরা জানেন কার কাছে আছে খরচ করার মতো উদ্বৃত্ত, বাড়তি টাকার অসহায়তা নিয়ে কে আছে অপেক্ষায়। সুতরাং, এবং তারপরেই, এলো টেরিলিন, জুতো, সাইকেল ঘড়ি ট্রানজিসটরের স্বপ্ন!

সদ্য-যৌবনে পা-দেওয়া পঞ্চদশী মেয়েটির শরীর ও মনে আসছে স্বাদ-বদলের অনুভূতি; কিন্তু তার গালভর্তি ব্রণ। আয়নায় তাকালেই মন কালো। ভাবনা কী! ব্যবহার করো অমুক কোম্পানির তৈরি অমুক ক্রীম—ব্রণের যম! রঙ ময়লা ব'লে কেউ

তাকাচ্ছে না? ব্যবহার ক'রে ছাখো অমুক সাবান। চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্যের চাবিকাঠিও ঐ সাবান! সুন্দরী যুবতীর ভালোবাসা কি অমনিই আসে! তার জন্যে চাই আকর্ষণীয় পৌরুষ আর ব্যক্তিত্ব। এ-সব দিতে পারে অমুক রেডিমেড শার্ট—ঠিক আজকের যুবকদের কথা মনে রেখে আজকের ধাঁচে তৈরি! ব্যস, আর কথা নেই! মধ্যবিত্ত পরিবারের রোগা, ঢ্যাঙা যুবকটি—খাদ্যে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব ইতিমধ্যে যাকে ক'রে তুলেছে স্তিমিত, যুবতী-সান্নিধ্য যার কাছে শুধুই স্বপ্ন, ছুটল সে পঁয়ষট্টি টাকা দামের ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে। প্রভাব যেখানে সম্পূর্ণ, দ্বিধা ও প্রশ্ন কাটিয়ে মস্তিষ্ক যখন একই উদ্দেশ্যের প্রতি একরোখা—সেখানে এবং তখন, কেউই এবং কিছুই পারবে না তাকে নিরস্ত করতে; এমনকি বোঝাতে যে পৌরুষ বা ব্যক্তিত্ব কিছু জন্মসূত্রে পাওয়া এবং কিছু অর্জিত গুণের সমাহার। একটি শার্ট কোনো সমস্যার সমাধান নয়। তবু, নতুন ব্র্যাণ্ডের শার্টে তাকে মানাবে দিব্যি এবং ভবিষ্যতে এর চেয়ে নিরেস কিছু সে ব্যবহার করবে না। সূতীর জায়গা নেবে পলিয়েস্টার। সেখানেই শেষ হবে না। স্বাস্থ্যের জন্যে তারপর সে ছুটবে বিজ্ঞাপিত প্রোটিন ও ভিটামিন সংগ্রহে, খসখসে গালের জন্যে আফটার-শেভ লোসন এবং পরিপাটি চুলের জন্যে নামী খেলোয়াড় দ্বারা ব্যবহৃত হেয়ার-ক্রীমের পিছনে!

সকালের কাগজ খুললেই বিজ্ঞাপন রেডিওর নব ঘোরালেই বিবিধ ভারতী। রাস্তায় বেরুলেই হোর্ডিং, নিয়ন-সাইন, কিয়স্ক, পোস্টার। সিনেমায় গেলেই স্লাইড ও শর্ট। দোকানে দোকানে শো-কার্ড। বাসে ধূমপান বারণ—এমনকি অমুক ব্র্যাণ্ডের সিগারেটও নয়। ট্রামের গায়ে গরমে গা জুড়োতে আছে সবচেয়ে বেশী কাটতির পাখা, ভিড় ঠেলে কোনো রকমে ভিতরে ঢুকলেই হলো—হাতি নাচছে আনন্দেতে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে। সম্প্রতি টেলিভিসনও হতে শুরু করেছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে। এ-দেশে সরকারী,

বেসরকারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি বছর বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হয় প্রায় আশি কোটি টাকা। এ-খরচ হিসেবের মধ্যে। হিসেব বহির্ভূত, নানা ধরনের হঠাৎ-প্রয়োজনের এবং পণ্য নয় এমন সব বিজ্ঞাপনের খরচ ধরলে এই অঙ্ক হেসে-খেলে পৌঁছুবে এক শো কোটিতে। অথচ, প্রতিষ্ঠান, পণ্য বা ব্র্যাণ্ড-পিছু আলাদাভাবে ধরলে এই খরচ কোনো ক্ষেত্রেই ঐ-সবের সমগ্র বিক্রয়-মূল্যের এক থেকে পাঁচ শতাংশের বেশী নয়। সমগ্র দেশে এই কাজে নিযুক্ত আছেন কয়েক হাজার ব্যক্তি, আছে ছোট, মাঝারি ও বড়ো অসংখ্য অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী। আছেন বহু প্রফেসানাল ও স্পেসালিস্ট। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নে তাঁরা শুধু তুখোড়ই নন; অনেকক্ষেত্রে জীবনধারা নির্ধারণে ট্রেন্ড-সেটার।

এ-সব আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, পরিভাষা অনুযায়ী যে এখনো 'উন্নয়নশীল'। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, পশ্চিম জারমানী—সেখানের যজ্ঞ আরও বিরাট। এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ-পর্যন্ত সাতাশ-আঠাশ বছরে আমাদের জীবনযাত্রার মান হয়েছে রীতিমতো উন্নত, দিনযাপন ও অভ্যাসের ছকও গেছে পালটে। ঠিক কতোখানি তা বলতে পারবেন প্রবীণরা। তবু, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যে-সব দ্রব্য ও অভ্যাসকে আমরা এখনো ভাবছি অর্জনযোগ্য, ওরা সেগুলিকে নিয়ে গেছে বর্জনের স্তরে। ভোগ্যপণ্যের নিত্য নতুন উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার তাদের করে তুলছে নতুনতর জীবনধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন ও উৎসাহী। ক্লান্তি কি আসছে না? আসছে; ক্লান্তির ফলেই তৈরি হচ্ছে সমাজের ভিতর সমাজ। আসছে হিপিরা, তৈরি হচ্ছে ন্যুডিস্ট কলোনী, সিঙ্গলস সোসাইটি ও ওয়াণ্ডারারস্। বাড়ছে মন-মগজ-ও-শরীরকে ঝিমিয়ে রাখার নানা প্রক্রিয়া। এবং এই নতুন সমাজ ও প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যেও প্রত্যহ নতুন পরিকল্পনা আঁটছে

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। উদ্ভাবিত হচ্ছে বিপণনে নতুন উপায় এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্যে বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা পশ্চিমের দেশগুলিতে জীবন-ধারা ও মানসিকতার যে-বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে ও ঘটাচ্ছে, তা মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের করে তুলেছে চিন্তিত। এ নিয়ে গবেষণা, লেখালেখিও কম হয়নি। আমেরিকায় র‍্যালফ নাদের ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে আন্দোলন (কনজিউমারিজম) শুরু করার অনেক আগেই এই বিতর্কের সূচনা। অনেকেরই মতে এটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপকীর্তি। টেকনোলজির অগ্রগতির ফলে একদিকে যেমন উৎপন্ন হচ্ছে রাশি রাশি ভোগ্যপণ্য (এবং মারণাস্ত্র), তেমনি একই কারণে বেড়ে উঠছে, সে-সব বিক্রির জন্যে চাহিদা সৃষ্টি করা। ফলে বিজ্ঞাপন। মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এর প্রভাব বিশ্ব ও সমাজের কতো গভীরে, তা পর্যালোচনা ক'রে দেখিয়েছেন জোয়ান রবিনসন। আবার, বারান ও স্যুইজির মতে, যে-কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব শুধু লড়াই-নীতি বা মিলিটরিজম-এর সঙ্গেই তুলনীয়। এতো বিজ্ঞাপন ক'রে নিত্যনতুন যে-সব ভোগ্যপণ্য বিক্রির চেষ্টা চলেছে, তার শতকরা পঁচানব্বুই ভাগই বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। এ-শুধু অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে —মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ছোটানো। ফলে মানুষ ক্রমশ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তার নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব থেকে।

আরও একটু এগিয়ে বলেছেন অ্যালভিন টফলর। মানুষের পক্ষে আদৌ আবশ্যিক নয় এমন সব জিনিস তৈরি করা, বাজারে ছাড়া এবং তা নিয়ে বিজ্ঞাপন করার লক্ষ্যই হলো ক্রেতাদের মান-সিকতায় চাপ সৃষ্টি ক'রে বাড়তি কিছু বের ক'রে আনা। আর এই চাপ সৃষ্টি করা হয় এমনভাবে যাতে কোনো উপযোগিতা না থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা বা ভোক্তা হাসিমুখে কিনে ফেলেন বিশেষ-বিশেষ

জিনিস। মোটরগাড়ির ড্যাশবোর্ডে এখন এমন অনেক বোতাম, নব ও ডায়াল যুক্ত করা হয় যেগুলির সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের সম্পর্ক নেই কোনো। কিন্তু, প্রভাব যেহেতু মানসিকতায়, সুতরাং অনেকেই এগুলি নাড়াচাড়া ক'রে সুখ পান এবং ভাবেন এ-সবই আরও বেশী নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের সহায়ক। অন্যদিকে, গলব্রেথের মতো অর্থনীতিবিদ আরও বেশী উপার্জন ও আরও বেশী ভোগের চেষ্টার ভিতর সমাজ ও নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক কিছুই লক্ষ্য করেননি। মার্কেটিং ও অ্যাডভার্টাইজিং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিরাও মনে করেন, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁরা পরোক্ষে সামাজিক দায়িত্বই পালন করছেন।

এসব তত্ত্বের অনেকটাই সত্য, আবার অনেকটাই নয়। বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, উন্নততর জীবনযাপনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার কাজটি খুব সহজ নয়। বাজার, ক্রেতা, ক্রমক্ষমতা, চাহিদা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে খুব ভালো জানাশোনা না থাকলে কাজটি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর মতোই হয়ে পড়ে অসাধ্য। এই কাজের সুবাদেই বিশ্বময় ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে অ্যাডভার্টাইজিং ইণ্ডাস্ট্রি, যেখানে দেশে-দেশে পাকা মাথার ছড়াছড়ি।

আমরাও পিছিয়ে নেই। চারপাশের মানুষজন ও জীবনযাপন প্রণালীব দিকে তাকালেই বুঝতে পারব তফাতটা কোথায়। দশ কি পনের বছর আগে কেউ ভাবতেও পারতেন না ঘরে-ঘরে ইনস্ট্যান্ট কফি, হেয়ারক্রীম, সিনথেটিক ফাইবার, শাম্পু, ফেসক্রীম, ফ্রিজ, ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস প্রভৃতির এতো ব্যাপক ব্যবহার। ভাবতে পারতেন না পোশাকের এত বৈচিত্র্য। এক নজরে কেউ বলতে পারবেন না এই কলকাতা শহরের রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, অফিসে, সিনেমা-থিয়েটারে যে-সব পুরুষ চোখে পড়ে তাঁদের কজন ধুতি পরেন, ক'জন ট্রাউজারস। এমনকি ট্রাউজারস যাঁরা পরেন তাদের মধ্যেও আছে শ্রেণীবৈষম্য। ডিজাইন ও কাট দেখেই বোঝা যাবে কে

কতোটা আধুনিক। সাদার ব্যবহার নেই বললেই হয়। পরিবর্তে এসেছে রকমারি রঙীন, স্ট্রাইপ, 'ব্লিডিং' ও 'শকিং' রঙের জামা। বড়বাবু নামধেয় ব্যক্তিরা এখনো কোনো কোনো অফিসে আছেন বটে, কিন্তু সে শুধু নাম। পোশাকেব মাধ্যমে আর তাঁদের চেনা যায় না।

আমরা বদলে যাচ্ছি দ্রুত ও নিয়মিত। এই বদলানোর ব্যাপারে আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ছে বিজ্ঞাপনের। তার প্রভাব অসীম। মন্ত্রীর বক্তৃতা, শিক্ষকের নির্দেশ, বাপ-মার উপদেশ এবং বন্ধুদের পরামর্শ—সম্ভবত এ-সবের চেয়েও অনেক বেশী। 'ধূম-পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর', সিগারেটের প্যাকেটে ছাপার অক্ষরে এই ঘোষণার পরও সিগারেটের বিক্রি বেড়েছে না কমেছে তা বলতে পারবেন বিভিন্ন সিগারেট প্রস্তুতকারকরা। কিন্তু, আসল তামাকের অতুলনীয় স্বাদের অনবরত হাতছানি এড়ানো সহজ নয়। এমনকি যে-মদ্য-পানের অভ্যাস অন্তত দশ বছর আগেও বাঙালি সমাজে নিষিদ্ধ বলে গণ্য হতো বর্তমানে তা জলপানের মতো সহজে ঢুকে পড়েছে আমাদের অনেকেরই প্রাত্যহিক সূচিতে। এখন ছেলে থেকে বুড়ো কারুর মনেই এ বিষয়ে সংস্কার বলে তেমন কিছু নেই—অন্তত তথাকথিত সাহেব-সুবোদের মধ্যে তো নেই-ই। তাই 'মাতাল' কথাটাও শোনা যায় কম। হবু জামাই একটু-আধটু মদ ছোঁয় না শুনলে অনেক শাশুড়ীই এখন চিন্তিত হয়ে পড়েন—এই পিউরিটান মনোভাব নিয়ে চাকরিতে উন্নতি হবে কি! এই কলকাতা শহরেই সম্পন্ন অনেক পরিবারে এখন সান্ধ্য-অতিথিদের চা-কফির বদলে আপ্যায়ন করা হয় অন্য পানীয় দিয়ে। 'চা খাবেন তো?'-র বদলে শোনা যায়, 'হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ? ব্র্যাণ্ডি? হুইস্কি?' বলতে কি, মাতৃভাষা এবং মূল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস ছাড়া আর সব কিছুতেই এখন আমরা কমবেশী পশ্চিমী। আর এই পশ্চিমী রুচি ও অভ্যাস অজ্ঞান্তে ও ক্রমাগত আমাদের ওপর স্প্রে ক'রে যাচ্ছে বিজ্ঞাপন।

বদলটা টের পাওয়া যায় বিশেষত মেয়েদের মধ্যে। বহিরঙ্গের পরিবর্তনে ও বৈচিত্র্যে তাঁরাই আসেন প্রথম। এবং মজার কথা, শতকরা ষাটভাগ ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনেরই লক্ষ্য তাঁরা। সহজ কারণে। আমাদের সংস্কার, আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় যতোই পরিবর্তন আসুক, মেয়েরা এখনো পুরুষের গৃহিণী, সচিব ও শিষ্যা, তাঁরাই প্রেমিকা ও জননী। রূপের সমস্যা তাঁদের, সংসারের সমস্যাও প্রধানত তাঁদেরই। উপভোগের ব্যাপারে মত ও ধারণার পরিবর্তনে মেয়েদের মনের স্থিতিস্থাপকতা ও প্রসার পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। একটি পুরুষ তাঁর সিগারেটের ব্র্যাণ্ড চেঞ্জ করতে যতো সময় নেন ও যতোবার ভাবেন, তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং নির্ভাবনায় মেয়েরা ব্র্যাণ্ড বদল করেন ট্যালকম পাউডার, সাবান, ফেসক্রীম কি অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের। কেনাকাটা বিষয়ে পুরুষের রুচি পরিবর্তনেও প্রভাব বিস্তার করেন তাঁরাই। বিজ্ঞাপনদাতারা এ-তথ্য জানেন। তাই, এমনকি শার্টিং বা স্যুটিং, চা বা কফি, ব্লেড, শেভিং ক্রীম বা আফটার-শেভ লোসন —পুরুষের ব্যবহার্য এইসব জিনিসের বিজ্ঞাপনেও মডেল হিসেবে দেখা দিচ্ছেন মহিলারা, বক্তব্যও রাখা হচ্ছে তাঁদের কাছে। কখনো সত্য সাজিয়ে, কখনো বা নির্লজ্জভাবে—যৌনতাবোধে সুড়সুড়ি দিয়ে, রুচি বিসর্জন দিয়ে। কে কীভাবে কোন্ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, এ-বিষয়ে কার মনের প্রতিক্রিয়া কি, সে-কথা আলাদা। ইতিমধ্যে কখনো জেনেশুনে, কখনো না জেনে পুরোনো পোশাক ছেড়ে আমরা যে ঢুকে পড়ছি নতুন খোলসে, তা অস্বীকার করা যাবে না।

আজকের মেয়েদের পোশাকে, রূপসজ্জায় এই বদলের ছবি অস্পষ্ট নয়। চপ্পলের বদলে এসেছে এলিভেটেড প্ল্যাটফরম্। সায়ার বদলে ব্রীফ। অনেক বাড়ির মেয়েই 'সেমিজ' বলতে ঠিক কী বোঝায় বলতে পারবেন না। বয়স্ক যাঁরা সেমিজ পরতেন,

তাঁদেরও অনেকে—এমনকি পঞ্চাশোধ্বে´ এসে—তুলে নিয়েছেন ব্রেসিয়ার। এবং অন্যান্য উপাদান। অল্প লিপিস্টিকের ছোঁয়ায় যদি ঠোঁটদুটি বয়স ফিরে পায়, মন্দ কী! চুল পাকলে কাঁদবার দরকার নেই—কলপের বিজ্ঞাপন মা আর মেয়েকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'বলুন তো কে মা, কে মেয়ে? বিজ্ঞাপনই বলে দিচ্ছে, 'কিছু বঙরূপ এমনও আছে, সময় হার মানে যার কাছে।'

আমার পরিচিতাদের মধ্যেই এ-রকম একজনকে জানি, দু' বছর আগেও যিনি তাঁর কলেজ-পড়া মেয়ের স্লিভলেস ব্লাউস পরে রাস্তায় বেরুনো পছন্দ করতেন না। এখন নিজে যে শুধু স্লিভলেসই পরেন তা নয়, সন্ধ্যার ফ্লুরোসেন্ট আলোয় তাঁর মুখে বোলানো মিহি রেশমের পরশও চোখ এড়ায় না। এ-সবের আড়ালে বয়সকে বাঁধতে শুরু করেছেন কমফর্ট-এর দিব্যি দিয়ে। বলতে দ্বিধা নেই, সফলও হয়েছেন।

দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে আরও অনেক। তুলনায় কলকাতা এখনও অনেক বেশী ঢিমেতালা। এখানে হাল-ফ্যাশানকে গ্রহণ করার গরজ যতোটা আছে সাহস ঠিক ততোটা নেই। তাই, বেলবটম, ট্রাইজারস ও ম্যাক্সির চাল শুরু হলেও এখনো বাঙালী মেয়েদের প্রধানতম পোশাক শাড়ি। ব্লাউজের মাপ ও কাট, পেট-পিঠ-বুকের তীব্রতা স্পষ্ট করলেও, আড়াল দেওয়ার জন্যে সতর্ক হাত সব সময়েই আঁচল খোঁজে। বম্বে বা দিল্লী—বিশেষত বম্বে, এগিয়ে গেছে অনেক। আধুনিকারা সেখানে ঘোরাফেরা করেন টানটান পোশাকের সোহাগ জড়িয়ে, বাস্ট-ও-নেকলাইন খুঁচিয়ে, কখনো ব্রা-লেস। ফ্যাশান, রূপ ও রুচি সম্পর্কে বাঙালী মেয়েদের বাছ-বিচার ও স্পর্শকাতরতা খুব তীব্র না হ'লে এ-হাওয়া কলকাতাতেও এসে পড়বে এবং অচিরে। জোয়ার কীভাবে ত্বরান্বিত করতে হয় তা জানেন, বিজ্ঞাপনদাতারা। জানেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতি কোন লক্ষ্যে ধাবিত করে

সাধারণ মানুষকে। জানেন, দুর্বলতা ও সংস্কার কোথায় কতখানি এবং তা ভাঙতে হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞাপনের প্রভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে, সাদা চোখে এটা লক্ষ্য ক'রেও অনেকেই তা মানতে চান না। তাঁদের অস্বস্তি প্রধানত দুটি ব্যাপারে। এক, এর ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের রুচি, শুদ্ধতাবোধ এবং সামাজিক আব্রু। দ্বিতীয়ত, এরই ফলে ছড়াচ্ছে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা—সেক্স-এর খোলাখুলি ব্যবহার। এর সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বা পণ্য বিক্রির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই কোনো। আপত্তি করছেন শুধু মহিলারাই নন, পুরুষরাও; এমনকি বিজ্ঞাপন ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরও অনেকে।

বিজ্ঞাপনে রুচিবিকার, নারী-শরীর ও সেক্স-এর ব্যবহার নিয়ে দুশ্চিন্তা আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র। ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই এ-বিষয়ে তৈরি হয়েছে নিয়ম—যে-কোনো বিজ্ঞাপন-দাতাকেই যার শর্ত মেনে চলতে হয়। আমেরিকায় এ নিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন সেখানকার মহিলাদের সংস্থা ন্যাশনাল অরগানাইজেসন ফর উইমেন। ১৯২২ সনে এঁদেরই প্রতিবাদে টেলিভিসনে প্রচারিত 'দ্য নিউলিওয়েড গেম' নামে একটি প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। বাতিল হয় প্রোগ্রাম প্রণেতাদের লাইসেন্স্। আলোচনা, বিতর্ক ও প্রতিবাদ এখনো থামেনি। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবাদের বেশিটাই এসেছে মহিলাদের পক্ষ থেকে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন সভায় এবং তাঁদের লিখিত বিভিন্ন আলোচনায় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে বিজ্ঞাপনে রুচি-বিকারও ছিল অন্যতম। এঁদের অনেকেরই ধারণা, এটাও সমাজে পুরুষের আধিপত্যের এবং তার অপব্যবহারের একটি নিদর্শন।

এ-বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা উচিত হবে না। ঠিক-ঠিক কারণগুলি খুঁজে বের করতে হ'লে যেতে হবে আমাদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার আরও গভীরে। লক্ষ্য করতে হবে ভারসাম্য

কোথাও টাল খাচ্ছে কিনা। কারণ, যে-রুচিবিকার নিয়ে এতো হইচই, তার প্রকাশ তো শুধু বিজ্ঞাপনেই সীমাবদ্ধ নয়; পাওয়া যাবে অন্যত্রও।

গত এক দশকে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রে যে দু'টি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, তার একটি 'সেক্স', অন্যটি 'ভায়োলেন্স'। গত দশ বছরে রচিত ও প্রকাশিত সাহিত্যের—গল্প বা উপন্যাসের—গড়পড়তা বিষয়ও এই। এবং এগুলি যে বক্স-অফিসের কৌলীন্য বা বেস্ট-সেলারের মর্যাদা পেয়েছে, তা শুধুই পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় নয়। গত কয়েক বছরে পর্নোগ্রাফি ও সেক্স নিয়ে যতো পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে, সংখ্যায় ও বিষয় পরিবেশনের তীব্রতায় তা আগের যে-কোনো পরিসংখ্যানকে হার মানাবে। আমাদের দেশও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। সম্প্রতিকালের অধিকাংশ জনপ্রিয় হিন্দি ছবির বিষয় কি, এবং এগুলি চলে কাদের আনুকূল্যে—এমনকি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গেও, তার বিচার করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। ভারতে গত কয়েক বছরে চলচ্চিত্র ও ফ্যাশান বিষয়ক যতো নতুন পত্রিকা বেরিয়েছে, তার তুলনায় সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা বেরিয়েছে অনেক কম এবং এই ধরনের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকারই প্রচার-সংখ্যা হয় কমেছে, না-হয়, উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো শুধুই মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট বহুল-প্রচারিত পত্রিকাগুলির বিষয়সূচির রাতারাতি পরিবর্তন। পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট হালের কয়েকটি ম্যাগাজিনের মতো এরা হয়তো 'দিস ইজ গ্লামার' নাম দিয়ে ব্লো-আপে পরিপূর্ণ ন্যুড ছাপে না; কিন্তু, এদেরও প্রকাশিত বিষয়বস্তুর শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগই হলো সেক্স বা এমন কিছু—যার লক্ষ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন।

এ-সব যুক্তি বিজ্ঞাপনে রুচিহীনতা সমর্থন করার জন্যে নয়। মনে হয়, বিজ্ঞাপন যাঁদের উদ্দেশ্যে করা হয় তাঁদের অনেকেই এ-সব

জানেন এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব রুচি এবং প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন। সমাজের একাংশের ঝোঁক যদি নিম্নগামী হয়ে থাকে, তাহ'লে বাকি অংশও যে ভীরু পায়ে অনুসরণ করছেন তা মনে করবার কারণ নেই। এই টানাপোড়েনের মধ্যে যে-বিজ্ঞাপন ন্যায্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির, তা কাজ ক'রে যাবেই।

বিজ্ঞাপনের প্রভাব ও তার ফলাফল সম্পর্কে কার কি ধারণা জানার জন্যে সম্প্রতি আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আটজন যুবতী ও মহিলার সঙ্গে আমি কথা বলি। এঁদের মধ্যে দু'জন কলেজের ছাত্রী, দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ; একজন কমার্শিয়াল ফার্মের স্টেনোগ্রাফার, একজন অধ্যাপিকা এবং দু'জন বিবাহিতা, গৃহবধূ। এই প্রসঙ্গেই বেরিয়ে আসে মেল ডমিনেশন বা পুরুষের আধিপত্যসহ অনেক কথা। যেমন, বলার ধরনে তারতম্য থাকলেও, এঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন, আধিপত্য কথাটার ব্যাখ্যায় ভুল না থাকলে শারীরিক পার্থক্যের কারণে এবং প্রয়োজনে এঁরা স্বেচ্ছায় মানবেন পুরুষের বশ্যতা। এঁরা চান বিয়ে করতে এবং সন্তানের জননী হ'তে, চান আবশ্যিক নিরাপত্তা—যা দিতে পারে পুরুষই। কমবেশী এঁদের প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপন পড়েন খুঁটিয়ে। জানেন নতুন কোন কোন জিনিস ছাড়া হয়েছে বাজারে। শাড়ি ছাড়াও মেয়েদের উপযোগী অন্য কোনো পোশাক পরায় এঁদের আপত্তি নেই। এঁরা প্রত্যেকেই মনে করেন, বম্বে-ধরনের হাল-ফ্যাশানের পোশাকে মেয়েদের অনেক বেশী স্মার্ট দেখায়। তবে শুধু স্মার্টনেসের স্বার্থেই অনুকরণ কেউই সমর্থন করেন না। এঁদের মধ্যে তিনজন বাড়িতে বা পিকনিকে বেলবটম বা স্পোর্টস্ পরেন, কিন্তু অন্য সময় পরেন শাড়ি। যাঁরা বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী, তাঁদের কাছে এ-সবের আকর্ষণ সত্ত্বেও শাড়িই ভালো লাগে ; তবে স্বামীদের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে যে লুঙ্গি বা ট্রাউজারস্ পরেন না তা নয়। এঁদের কারুর ভূতের ভয় নেই ; কিন্তু দুষ্ট লোক সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান হন। এঁদের মধ্যে তিনজন

মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশায়—এমনকি আরও একটু এগিয়ে খাওয়ায়—আপত্তিকর কিছু ছাখেন না। অন্তত একজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, এ-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্বীকার করেন। তিনি কনট্রাসেপ্‌টিভ্‌স এবং কনডমের ব্যবহার জানেন; জানেন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারী প্রচারের খুঁটিনাটি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় যেটা সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য করে তা হলো ভারতে তৈরি এই কনডমটি সম্পর্কে তিনি প্রথম অবহিত হন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

এই তথ্যে যাঁদের ভুরু কোঁচকাবে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু, এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশায় যাঁদের নীতিগত আপত্তি, তাঁরাও জানেন নীতির দোহাই দিয়ে মেলামেশা বন্ধ করা যাবে না। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ, বিচারবোধ, নীতি ও সংস্কারবোধ। কিছু নিতে গেলে কিছু দিতেই হয়। এই সূত্রেই চলেছে প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানের নিরন্তর যুদ্ধ। নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত যে-সব প্রবণতার ওপর বিজ্ঞান এখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, সেখানে প্রবণতাগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও সে চাইছে তার কুফলগুলি প্রতিকারের। তার একটি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যুবক-যুবতীরাই শুধু নন। বর্তমানে অনেক বাবা-মা'ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে মেনে নিয়েছেন পাশ্চিমী 'পারমিসিভনেস'। তা ব'লে সমাজ উচ্ছন্নে যায়নি। ইতিমধ্যে অন্য কোনো বিপর্যয় না ঘটলে যাবেও না। কারণ, শিক্ষা ও অন্যান্য দিকে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মুখগুলিতে ক্রমশই ফুটে উঠছে বুদ্ধির দীপ্তি, বাড়ছে দায়িত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। যৌথ পরিবারের সামগ্রিক বোধ-বুদ্ধি-পরামর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তি

এখন বেশী ক'রে নির্ভরশীল হ'চ্ছে নিজের বোধবুদ্ধির ওপর। বিজ্ঞাপনদাতারা এ-তথ্য জানেন: এবং জানেন বলেই, অবস্থার প্রকৃত মূল্যায়নের প্রতি যতো দিন যাচ্ছে ততোই তাঁরা ঝুঁকছেন বেশী। তাঁদের কাজও হয়ে পড়ছে কঠিন। অর্থহীন চটক বা স্তোকে মন না ভুলিয়ে ক্রেতা বা ভোক্তার বিচারবুদ্ধির কাছেই চলেছে তাঁদের আবেদন। দশ কি পনের বছর আগে যে-ধরনের বিজ্ঞাপন হামেশাই চোখে পড়ত আমাদের, তার সঙ্গে আজকের বিজ্ঞাপনের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এ-কথা আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশগুলির সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য ভারতীয় বিজ্ঞাপনের সম্পর্কেও।

আশার কথা, আমাদের দেশের বড়ো বড়ো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান (বিজ্ঞাপনদাতা) এবং পেশাদার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী-গুলির অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে সুরুচির সমর্থক, তাঁদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই এঁদের নিয়ন্ত্রণে। এঁদের অনেকেরই ধারণা পেশাদারী জ্ঞানের অভাব এবং ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে না পারার কারণেই কিছু বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্সী বিজ্ঞাপনে আমদানি করেন এমন সব উপাদান—যা রুচির পক্ষে বিভ্রান্তিকর। এঁদের সংখ্যা কম। পেশাদারী দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও কমবে। কমবে ব্যবসায় টিকে থাকার তাগিদেই।

এ-দেশের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার কী ধারণা সে-সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম উপরোক্ত মহিলাদের কাছে। তাঁদের প্রায় সকলেই মনে করেন, সাধারণভাবে ভারতে তৈরি বিজ্ঞাপনের মান উন্নত। কাগজের পাতা না উল্টিয়েও অনেকগুলি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের উল্লেখ করেন তাঁরা, পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করেন বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের এবং এইসব ব্র্যাণ্ডের প্রস্তুতকারকদের নাম। এই তালিকায় আছে চা, কফি, সিগারেট, লিপস্টিক, বেবীফুড, হেল্‌থ টনিক ও ট্যাবলেট, সাবান,

হেয়ার অয়েল, ব্রেসিয়ার শাড়ি, এমন কি ইলেট্রিক ফ্যান, রেডিও রেফ্রিজারেটর এবং মোটরগাড়ির টায়ারও! প্রস্তুতকারকরা সকলেই সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনুযোগ করেন সেইসব বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে যেগুলি বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের গুণাগুণ প্রচারের চেয়েও জোর দেন যৌন-আবেদন সৃষ্টির ওপর। তাঁদের প্রশ্ন: এ-সব দিয়ে সত্যিই সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্ররোচিত করা যায় কিনা।

আপত্তি ও প্রশ্ন দু'টির উত্তর নির্ভর করে কোন বিজ্ঞাপন ক্রেতা বা ভোক্তার মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তার ওপর। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে উপরোক্ত মহিলাদের ইদানীংকালে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বিশেষ ধরনের জিনিসের বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়—যে জিনিসগুলি বিশেষভাবেই মেয়েদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং বিজ্ঞাপনেও মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মেয়েদেরই। এ-ক্ষেত্রে এঁদের সকলের প্রতিক্রিয়াই প্রায় একরকম। যে-বিজ্ঞাপনটিকে এঁরা প্রত্যেকেই সেরা বলে নির্বাচন করেন সেটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের। দ্বিতীয় পছন্দ প্রায় দু'টি বিজ্ঞাপন। তার একটি সেলাইকলের এবং অন্যটি—কিঞ্চিৎ অবাক হতে হলেও—স্যানিটারি ন্যাপকিনের। সবচেয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে একটি বাস্টলাইন ডেভলপারের বিজ্ঞাপন।

বিভিন্ন বয়স, শিক্ষা ও সামাজিক স্তরের এই মহিলাদের প্রতিক্রিয়াগুলি যেমন সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাগুলিকে সমর্থন করে তেমনি বিজ্ঞাপনের ভূমিকা, পরিকল্পনা ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও আমাদের সাহায্য করে বুঝতে। এই প্রতিক্রিয়া বজায় থাকলে বিজ্ঞাপনে রুচি নিয়ে আমাদের চিন্তিত হবার খুব একটা কারণ আছে বলে মনে হয় না।

১৩

* * *

প্রথম যুক্তফ্রন্ট রাইটার্স ছেড়ে পথে নামলেন আইন অমান্য করতে। ষাটের শেষ। দু' একদিনের মধ্যেই গ্রেফতারের আগে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ধ্বনি দেবেন, এখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। আন্দোলনের তৃতীয় দিন বেলা দেড়টায় এসপ্ল্যানেড, ধর্মতলা, সেনট্রাল অ্যাভিনিউ জুড়ে যুদ্ধক্ষেত্র। রাজভবন আগলাতে কে সি দাশের দোকানের সামনে থেকেই পুলিশের ব্যারিকেড। ঝড়ের সম্ভাবনায় যে যার নিজেকে তুলে নিয়েছে রাস্তা থেকে। ইতস্তত বোমার শব্দ, ক্ষ্যাপা ক্ষোষের চেহারা নিয়ে ছুটোছুটি করছে পুলিশ ভ্যান। ওই যে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের সামনে একটা জীপের ভিতর থেকে জিব দেখাচ্ছে লকলকে আগুন। এই সময় কেউ রাস্তায় বেরোয় না।

কিন্তু, এই ভদ্রলোককে দেখুন। পরনে ছিমছাম পোশাক, মসৃণ কামানো গাল, অল্পচুল মাথায় শ্যাম্পুর চেকনাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলির মধ্যে থেকে এইমাত্র উদিত হলেন সেনট্রাল অ্যাভিনিউর ওপর, দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের একটা বাড়ির ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

ভিতরের বর্ণনা দেবার খুব বেশি দরকার নেই। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে কাঠের-হাতল স্টীল-বডির চেয়ার। দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো কফি বোর্ডের পোস্টারে দাড়ি, গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি নিয়ে নীল-গিরির কাছাকাছি জায়গার মানুষের পাথুরে মুখ, সঙ্গে থালায় সাজানো কফি-বীজের কম্পোজিসন পাশে স্লোগান: এ ফাইন টাইপ, এ ফাইন কফি। বোথ আর ইণ্ডিয়ান। আজ বাইরের শো-কেস

বন্ধ ; না হ'লে এসপ্ল্যানেড থেকে সেনট্রাল অ্যাভিনিউয়ে পড়ে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে যেতে যেতেও এই স্লোগান যে-কারুর চোখে পড়ত। এরই নাম কফিহাউস—ওই এলাকায় কলকাতা চেনার খুঁটি। ট্যাক্সিওয়ালাকে 'কফিহাউস' বললে সটান নিয়ে আসবে। নর্থের ট্যাক্সি অবশ্য জিজ্ঞেস করতে পারে 'কলেজ স্ট্রীট ?' তখন বলতে হবে, 'না, সেনট্রাল অ্যাভিনিউ। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে হ'লে অচেনাকে ব'লে দিতে হবে 'লর্ডস্' না 'কমন্স্'।

পাশাপাশি দুই দরজা ; তবু কফি আর স্ন্যাকস্-এর দামের ফারাকে লর্ডস্-এর কৌলীন্য। একটু লক্ষ করলে বোঝা যাবে তফাত আছে ভিড়ের ধরনেও। ইতিহাসের কৌলীন্য অবশ্য কমন্স্-এরই প্রাপ্য। এটিই কলকাতার প্রথম কফিহাউস, যার পত্তন হয়েছিল চল্লিশের গোড়ায়। তারপর লাগল যুদ্ধ, হলো পাড়া-বদল। চলো কলেজ স্ট্রীটে। শুরু হলো অ্যালবার্ট হল—ছাত্রছাত্রী, তরুণ লেখক কবিদের সাহিত্যে (প্রেমেও কি ?) হাতে খড়ির জায়গা। যুদ্ধশেষে তৃতীয়ের খ্যাতি নিয়ে শুরু হলো লর্ডস্। তখন ছিল বেতের চেয়ার টেবিল। ডান-বামে প্রত্যক্ষ দল ভাঙাভাঙির মতো কমন্স্-এর ছাঁকা দল পুরনো ঘাঁটি ছেড়ে উঠে গেলেন লর্ডস্-এ। এখন কফি-হাউস পা বাড়িয়েছে যাদবপুরেও। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়েরটি দরজা বন্ধ করলেও, আছে হাজরার মোড়ে, বসুশ্রীর দোতলায়। ফুটকি এঁকে স্কেল টানলে উত্তর থেকে দক্ষিণে কফি-হাউসের ব্যাপ্তি দৈর্ঘ্যে স্টেটবাসের যে কোনো রুটের চেয়ে বড়ো। বনেদী কলকাতার একদা-সাক্ষী অনেক হর্ম্য ও মূর্তি স্থানচ্যুত হয়েছে এতোদিনে—সংখ্যায় কফিহাউসের বাড় কিন্তু কমেনি। মনে হয় আরও বাড়বে।

সেই কফি বোর্ডের পোস্টারে ফিরে আসি—ওই কম্পোজিসন বদলানো দরকার। দাড়ি গালপাট্টা মুখের বদলে বসিয়ে দিন ওই ভদ্রলোকের মুখ—বোমা বারুদ এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে হন্তদন্ত

এইমাত্র যিনি ঢুকে পড়লেন লর্ডস্-এ ; কফি-বীজের পরিবর্তে আঁকুন ধূমায়িত কফির পেয়ালা ; স্লোগান পালটে লিখুন—এ স্পেশাল টাইপ, এ স্পেশাল ব্লেনড। বোথ আর ক্যালকাটান। চরিত্র ফুটবে।

ভদ্রলোককে দেখুন। খানিক আগেকার সশঙ্ক মুখে এখন ফুটে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। কারণ, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে অন্যান্য মুখের মধ্যে দু'তিনটি চেনা মুখ দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাঁর এগিয়ে যাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা যায়, বোমা-বারুদ-পুলিশ হাঙ্গামা নয়, মৃত্যুও নয় ; তাঁর এতোক্ষণের সমস্ত উদ্বেগ ক্ষরিত হচ্ছিল অভ্যাস থেকে বিচ্যুতির, কিংবা ওই মুখগুলিকে হারানোর আশঙ্কায়। এরপর চেয়ার টেনে জুত হয়ে বসবার অপেক্ষা শুধু। শুরু হলো সংলাপ :

ভদ্রলোক (রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে)—'কী খবর, 'ক', বিপ্লব আর কতো দূর ?'

ক (যিনি একজন অফিসজীবী ও ভদ্রলোকের বন্ধু, হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে)—'এখন দেড়টা। বারোটা নাগাদ বম্বেতে ল্যাণ্ড করেছে শুনেছি। চিন্তা নেই, এসে যাবে—'

ভদ্রলোক—'যাঃ, ঠাট্টা নয়।' (খ-এর দিকে তাকিয়ে) 'আপনি তো জার্নালিস্ট। লেটেস্ট খবর কী ?'

খ (অন্যমনস্কভাবে)—শুনছি, যাদবপুরের দিকে পুড়েছে, গুলিটুলিও চলেছে—'

ভদ্রলোক—'বলেন কী ! আমার বউ যে ওদিকেই গেছে ! বাড়ি ফিরবে কী করে !'

খ—'বিপ্লবও হবে, বউও বাড়ি ফিরবে, তা কী ক'রে হয় দাদা !'

ভদ্রলোক—'তা অবশ্য ঠিক।'

এখন আর-একটা প্রসঙ্গ দরকার। সামনে বেয়ারা, আপাতত কফির অর্ডার দেওয়া যাক। দেখতে-না-দেখতে দখল হলো আরও

একটি চেয়ার। বাইরে আবার পটকার শব্দ। ধূমায়িত কফির পেয়ালা সুড়সুড়ি দিচ্ছে চিন্তায়, কথা ছড়িয়ে পড়ছে কথায়। এইমাত্র চে গুয়েভারা এসে একটি চেয়ার দখল করলেন। ভদ্রলোক মদৎ পাচ্ছেন, বিপ্লব আর বউয়ে বিরোধ কোথায়! প্রসঙ্গ: কমরেড মাও কি ফিল্মস্টার বিয়ে করেননি! প্রসঙ্গ: চীনা ফিল্মস্টারদের বম্বের ফিল্মস্টারদের গ্ল্যামার আছে কিনা। প্রসঙ্গ: সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কমিটমেণ্ট নেই কেন?

কফি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কলকাতা এখন সুদূর আরজেনটিনা বা চীনে ভ্রাম্যমাণ। মাঝপথে উঠে পড়তে হলো ভদ্রলোককে। বিপ্লব বা বউয়ের ঠেলায় নয়, পেশার দায়ে—মাসান্তে হাজার দুইয়ের বিনিময়ে মাথা যেখানে বিকানো। বিপ্লব আর বউ পাশাপাশি হাঁটে না।

ভদ্রলোককে দেখুন। তিপ্পান্ন সালের ইকনমিকসের এম-এ। তখন লিখতেন কবিতা, রোজ সন্ধ্যায় চুটিয়ে আড্ডা দিতেন অ্যালবার্ট হলে। বুকে গোটা তিনেক প্রায়-প্রেমের অভিজ্ঞতা; লক্ষ্য কবি হওয়া। চৈতন্যে বিছুটি লাগল, পাস ক'রে বছরখানেক বেকার থাকবার পর। কোনোক্রমে জুটল একটা স্কুল-মাস্টারী, তারপর বহুদূর মফস্বল কলেজে অধ্যাপনা। বছর দুয়েক পরে আধা-সরকারী অফিসে ছশো টাকার চাকরি নিয়ে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। ততোদিনে লেখার কলম গেছে শুকিয়ে, অ্যালবার্ট হলের পুরনো বন্ধুরাও গেছে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, হারিয়ে। ধুলো পড়তে শুরু করেছে স্মৃতির গম্বুজে। একদিন ঘণ্টা তিনেক কলেজ স্ট্রীট কফিহাউসে একা-একা কাটিয়ে নতুনদের মুখ ও ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে করতে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন মন জুড়ে শুধু বিষাদ। দিন সাতেক পরে অফিস-ফেরতা ময়দানে জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবলেন, দেশে বিপ্লব আশু প্রয়োজন। তারপর, কেন ও কীভাবে বুঝতে না বুঝতেই আরও দু'বার চাকরি বদল, বিবাহ,

সন্তান-লাভ, সঙ্গীবদল, ছশো থেকে হু'হাজারে উত্থান, ফিল্ম সোসাইটির মেম্বারশিপ এবং—কিঞ্চিৎ ফর এডালট্স্ ওন্লি'র ছাপ নিয়ে—আবার ফিরে আসা আর-এক কফিহাউসে। কলেজ স্ট্রীটে নয়; সেনট্রাল অ্যাভিনিউয়ে। এখনো ছুলছেন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে।

ইনি মধ্যবিত্ত। বাঙালি মধ্যবিত্ত। পাঁচ-শোই হোক বা পাঁচ হাজার উপার্জনের বিভিন্নতায় থমকে থাকে না এদের শ্রেণী-চরিত্র। পেশা এক-এক রকম, নেশা কফিহাউস বা আড্ডা—ছুপুরে হোক বা বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায়, প্রতিদিনের অভ্যাস থেকে কফিহাউস এদের টানে।

কেউ কিছু পেয়ে যায়, কেউ পায় না। কেউ উত্তেজিত হয় অন্যের পাওয়ায়। জ্ঞান, পরচর্চা ও গুজবের বিনিময় চালাতে চালাতে এই বৃহৎ মধ্যবিত্ত পরিবারের সময় কাটিয়ে দেয় কফিহাউস। যৌবন যায়, যায় না যৌবনের বেদনা। পাক ধরে চুলে।

কলকাতায় এসে এই মধ্যবিত্ত বাঙালিকে দেখেছেন বেদ মেহতা 'বাক্যবাগীশ, উচ্ছ্বাসপ্রবণ কিন্তু প্রাণবন্ত' রূপে, যারা নিজেদের 'ফ্রেঞ্চ অফ দা ইস্ট' ব'লে ভাবে। সেনট্রাল অ্যাভিনিউ কফিহাউসের বর্ণনা প্রসঙ্গে জেফ্রে মোরহাউসের মন্তব্য আরো এক কাঠি সরেস: কলকাতা তার মহৎ ঐতিহ্য নিয়ে রসাতলে যাক, কফির পেয়ালায় বাঙালির কথার ফুলঝুরি ছুটবেই, সঙ্গে থাকবে 'পলিটিকাল্ একস-পিডিয়েনসি' আর 'রেভলিউসানারি কেডারস' গোছের বাছা ইংরেজি বুকনি। আর বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সদর্পে বলেছেন সত্যজিৎ রায়: কলকাতার কফিহাউসগুলোয় আইডিয়া যোগানোর মতো মাথাঅলা লোক প্রচুর। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ফিল্ম্ তৈরির দিকে ঝোঁকেননি বটে, কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকারের কাছে কলকাতার চেয়ে জ্যান্ত শহর আর হতে পারে না। কারণ, এ-শহরে সব সময়েই কিছু ঘটছে, ঘটে চলেছে।

সত্যি বলতে, কলকাতার চিন্তা ও মননের জগতে যা ঘটে তার অনেকটাই ঘটে কফিহাউসে। আমাদের ভদ্রলোককে যদি শুধুই কফিহাউসের নেশাগ্রস্ত টিপিকাল মধ্যবিত্ত ভাবি, তাঁর বিপরীতের সাক্ষাৎও এই কফিহাউসে। অনেক ইতিহাসের বীজ পরিস্ফুট হয় এখানে ; এখান থেকেই কেউ কেউ হেঁটে যান ইতিহাসের দিকে। দৃষ্টান্ত, সত্যজিৎ রায়—'পথের পাঁচালি'র স্বপ্নের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল এখানে, এই সেনট্রাল অ্যাভিনিউ কফিহাউসে। দৃষ্টান্ত আরও অনেকে। আজকের ডাকাবুকো কবি ও লেখকদের অনেকেই তাঁদের মধুর যুবকাল ব্যয় করেছেন কলেজ স্ট্রীট কফিহাউসে। ভবিষ্যৎ যাঁদের মগজে, তাঁদের অনেকেই এখন তাকিয়ে আছেন ধূমায়িত কফির পেয়ালায়। খেলো ঝড় একদিন ভূমিকা নেবে শিকড় ধ'রে টান দেবার।

কফিহাউস থেকে যাঁরা কোনো-না-কোনো কাজে চলে যান, তাঁদের অনেকেই আর ফেরেন না। কেউ কেউ থেকেও যান। আজীবন। যেমন রবিদা—রবি সেন, ঠিকানা : কফিহাউস (লর্ডস), সেনট্রাল অ্যাভিনিউ, কলকাতা। সাক্ষাতের সময় বেলা একটা থেকে দুটো। কফিহাউসের উদ্বোধনের দিন থেকে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন এক-টানা ; এখনো প্রথম দিনের সুদৃশ্য পেয়ালায় প্রাপ্ত বিনি পয়সার কফির স্বাদ লেগে আছে মুখে।

আমি এক-আধজনকে চিনি। অনেককেই চিনি না। কফি-হাউসের রহস্যের অনেকটাই তাই অজানা। তবু বুঝি, দৈবাৎ কোনো কারণে যদি কফিহাউসের দরজা বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে, তাহ'লে কলকাতা হয়তো রসাতলে যাবে না, কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের অনেকেই পরবেন কালো পোশাক। অখণ্ড অবসরে কেউ কেউ নাম লেখাবেন অবিচ্যুয়ারির খাতায়। হয়তো কলকাতার ইতিহাসও পাল্টে যাবে কিছুটা।

১৪

* * *

শীত শুরু হতে না হতেই এবার আমি ভারাক্রান্ত বোধ করছি। ভার শরীরে, ভার মনের উপর, ভার আমার চতুষ্পার্শময় সর্বত্র।

এই অগ্রহায়ণে গাছের পাতা নিষ্পত্র নয়, আকাশে তাকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের তালিমারা নীলের জের স্বতই চোখে পড়ে। শীত বলতেই যাঁদের গায়ে কাঁটা দেয়, কিংবা গোটা ঋতুকাল আদর ক'রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরবার মতো পোশাক যাঁদের অনন্ত, তাঁদের অনেকের গায়েই ইতিমধ্যে উঠেছে সোয়েটার কার্ডিগান কিংবা সান্ধ্যসুখ জোগাতে শাল। বেশ বোঝা যায় ডিজাইনের বাহার এবার গত বছরকে রেখে যাবে বহু দূর তফাতে ; খবরের কাগজ এবং গবেষণামনস্ক নিন্দুকেরা আমাদের চারিদিকের হাড়-পাঁজরা ও গণবুভুক্ষার ছবি ফুটিয়ে তুলতে যতোই তৎপর হোন, তার রঙীন নিয়ে পোশাক-আশাক পেলবতা জুড়ে শীত আসছে শত্তুরের মুখে ছাই দিতে।

রাস্তায় যেতে যেতে অন্যমনস্ক চোখ চলে যায় ট্রামের জানালায়, একান্ত যুবতী সেখানে সুন্দর ফোটোজিনিক আঙুলের তৎপরতায় উল্টো-সোজা কাঁটা ঘোরানোর মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে যাচ্ছে শরীরের তাপ। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে, সিগারেটে টান দিয়ে কিংবা বাজারের থলেয় জ্যান্ত কইমাছ ভরতে ভরতে, লোকে বলছে, শীত এসে গেল। যেন তার নীল নক্ষত্রময় দ্যুতি অবলোকন করার জন্যে প্রত্যাশিত চোখে উর্ধ্বমুখ বহুজন সমবেত হয়েছিল পোড়ো জমির উপর, আবির্ভাবের সম্ভাবনা শাখা-প্রশাখার খুশি নিয়ে এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে।

এ যে আমন্ত্রণ তা ভুল হবার নয়। অনুভূতি যাঁদের কম, দৃষ্টি যাঁদের থমকে থাকে শুধু সহনীয় দূরত্বের মধ্যে, তাদের চোখে আঙুল দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে জুতো কোম্পানীর ব্যানার-ঘোষণা: শীতকালেই তো সাজগোজ! ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সার্কাসের হাতছানি, নলেন গুড়ের প্রলোভন, আর একান্তভাবেই কলকাতাবাসীর জন্যে তৈরি শীতকালীন সূচী: সংস্কৃতি সম্মেলন। সকালের না-গরম না-ঠাণ্ডা ছা-পোষা রোদ্দুরে বাড়ির এক কোণে ব'সে তুলো ধুনতে ধুনতে যন্ত্রে তান তুলে যায় ধুনুরি: ধড়াং-ধড়াং-ধক্-ধক্। সে-শব্দে মরমে পশার লাবণ্য না থাকলেও, অন্ত্যজের ভূমিকা থেকে সে-ই স্মরণ করিয়ে দিতে পারে সারারাতব্যাপী সেতার-সরোদের মূর্ছনা। আর শয্যা যে অমৃতরূপ, তুলোয় যে প্রকৃত অর্থেই তুলির টানের ঘনিষ্ঠতা, তা বোঝাতেও শীতের তুলনা নেই। সার্থকভাবে প্রজননের ঋতু বলতেও এই শীত—তার রাজত্বে নেই পরিবার-পরিকল্পনার দৌরাত্ম্য, সম্প্রতি হিসেব কষে তাও বের ক'রে ফেলেছেন গবেষকরা।

চারিদিকের এতো প্রাচুর্য ও ইন্দ্রিয় সুখের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একা আমি ভারাক্রান্ত বোধ করি কেন। চতুষ্পার্শে ছড়ানো এমন অনপচয়িত সম্ভাবনার মধ্যেও কেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে শরীর ও মন—অতিদূর দূরত্ব থেকে নৈঃশব্দ্য ছুঁয়ে ক্রমশ সরব হ'য়ে ওঠে বিসর্জনের বাজনা! জানি না। শুধু সিগারেটের আগুন থেকে হাতের চেটোয় তাপ গ্রহণ করতে করতে নানা সন্দেহ দেখা দেয় মনে, মধুময় পৃথিবী ও তার মানুষজনের কাছে ইচ্ছে করে ক্ষমা চাইতে, আর প্রার্থনা করতে আর একটু সময়। হে জীবন, হঠাৎ-বিদায়ের আশ্লেষ থেকে এবার অন্তত ছাড় দাও। মানুষ তোমার আমন্ত্রণ চিনেছে, চেনেনি উপেক্ষা। তবু, তোমার সর্বস্ব আড়াল-করা অনিবার্য আক্রমণ থেকে এবার অন্তত অব্যাহতি দাও।

শীত কি বিদায়েরও ঋতু?—মৃত্যুর, কিংবা নির্বিকল্প চ'লে

যাবার? জানি না। তবু, অভিজ্ঞতার আড়ালে সত্য ব'লে যদি কিছু থাকে, তারও সায় আশঙ্কারই দিকে। দেখেশুনে মনে হয়, জন্মের নির্দেশ হেতু প্রজননের ঋতু যে-ঘনিষ্ঠ উত্তাপ চায়, পৃথিবীর জল-হাওয়া-সংকল্পে নেই তার পর্যাপ্ত আয়োজন। তাই সে হাত বাড়ায় জীবিত নিশ্বাসের দিকে।

শীতের কোলে জায়গা বড়ো কম। উত্তুরে হাওয়ায় টান শুধু চামড়াতেই ধরে না, ধরে নিশ্বাসে এবং প্রাণেও; এমনকি মনেও। গ্লেসিয়ারের শীতল অবজ্ঞা এড়াতে দিগন্ত ছেয়ে মরশুমী পাখির ঝাঁক চিড়িয়াখানার দিকে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে এলে তো খবরের কাগজের বিষয় হয়; কিন্তু, কেউ খবর রাখে না আমার ঘরের খাঁচায় পোষা প্রিয় শ্যামসুন্দর পাখিটি কিছু না জানিয়েই অতর্কিতে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে! অবোধ, নিষ্পাপ, এই ক্ষুদ্র জীবটিকে বিড়ালের আকস্মিক আক্রমণ থেকে বাঁচানোর প্রতিই ছিল আমাদের যতো আগ্রহ। শীত এলো নিঃশব্দে, ছুরির ডগায় হিম হাসি মিশিয়ে।

মানুষের প্রবণতা মানুষকে শেখায় জন্মের হিসেব নিতে। মৃত্যুর নয়। অন্যান্যদের কী অভিজ্ঞতা জানি না; কিন্তু, আমার জানাশোনা প্রিয়জনদের মধ্যে যাঁরা আজ নেই, তাঁদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে শীতকালে। শীতের প্রকোপে নয়; হয়তো রোগে, হয়তো আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা অপঘাতে—হয়তো বা অন্য কোনো কারণে, তবু সময়টা একই। ডিসেম্বর-জানুয়ারী তাই আমার কাছে মৃত্যুর মাস। শীত-সকালের নিয়ন্ত্রিত মধুর রোদ্দুরে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন খুশির খেলা, আমি তাঁদের দলে নেই। সেখানে স্পষ্টই আমি প্রত্যক্ষ করি অশ্লেষার রাক্ষসী বেলা। মনে হয় চারিদিক ক্রমশ ভরে উঠছে উপেক্ষায়, প্রাত্যহিক ব্যস্ততা ও কর্ম কোলাহলের মধ্যে কোথাও চলেছে বিষম অনাদরের প্রস্তুতি, আমি যার কিছুই জানি না। মনে হয় অনিশ্চিত দূরত্ব থেকে হঠাৎ পেয়ে যাব কোনো

দুঃসংবাদ—যাদের নিয়ে আমি, তাদেরই কেউ চ'লে যাবে হঠাৎ—জীর্ণ ইটের মতো খসে পড়বে দেয়াল থেকে। মনের মধ্যে হা-হুতাশ করে পোড়ো-বাড়ির হাওয়া।

শীতে তাই খোঁজ-খবরের জন্যে সচল হ'য়ে উঠি আমি। সাধারণত নির্বিকার, এই শীতে সারা দিনমান কেটে যায় সংবাদের অপেক্ষায়। প্রায়-অকারণ স্পৃহা থেকে টেলিফোন তুলে সম্বৎসর দেখা না-হওয়া বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি, 'ভালো আছো?' তার বিস্ময় কাতর করে না আমাকে। মনে মনে প্রার্থনা করি, ভালো থেকো। হয়তো তুমি সময় পাবে না, হয়তো আমি সময় পাব না—তারই জন্যে আমার এই আগাম প্রার্থনা। সন্ধ্যায় ক্লান্ত বাড়ি ফিরে প্রায় অভ্যাসবশে প্রশ্ন করি স্ত্রীকে, 'কোনো চিঠি আসেনি আজ?' সে হেসে বলে, 'রোজ রোজ কে তোমাকে চিঠি দেবে!' আমি চুপ ক'রে থাকি; মনে মনে বলি, না এলেই ভালো। তারপর বিছানায় টান টান হয়ে কাছে ডাকি শিশুপুত্রকে, 'আয়, একটু কাছে এসে ব'স।' উলের বলে মোড়া শরীর থেকে খেলায় ব্যস্ত চোখ তুলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কেন!'

আমি তাকে কিছুই বলতে পারি না। বলতে পারি না, শীত আসছে—তার কোলে জায়গা বড়ো কম। নবাগত তুই, তোকে পুরোপুরি জায়গা ছেড়ে দেবার আগে একটু উত্তাপ ছুঁয়ে নিই।

১৫

* * *

প্রথম প্রেমপত্র পেয়েছিলুম তেরো বছর বয়সে। সংখ্যা হিসেবে 'তেরো' অপাঙ্‌ক্তেয়, তা নিয়ে একটি ইংরিজী প্রবাদও চালু আছে। কিন্তু, আজ, এতোদিন পরেও, কৈশোরক সেই অনুভূতি বিস্মৃত হবার নয়। বয়সটাকে সেদিন নিতান্তই অপাঙ্‌ক্তেয় ও অশুভ ব'লে মনে হয়নি ; উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল অলৌকিকের আশ্চর্য চাবি এসে পড়েছে হাতের মুঠোয়, এর চেয়ে সুখকর অনুভূতি আর কি হতে পারে! সেটা হাফপ্যাণ্ট পরে ধোপাদের মাঠে ফুটবল খেলার বয়স, রাসভ কণ্ঠের মতোই প্রায় সব কিছুই রসকষহীন। সেই সময়, রুক্ষ নিরুত্তেজতার মধ্যে সে এলো কাব্যিক ভাবনার পতাকা মেলে, দারুণ দহন দিনের পর আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের বৃষ্টিধারার মতো।

ঘটনা হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয় যে বহু ব্যবহারে ব্যবহৃত উপমাগুলিকে আবার টেনে আনতে হবে। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে উত্তরোত্তর অভ্যস্ত হ'তে হ'তে স্মৃতিকে ছেঁটে ফেলার ব্যাপারে এখন অনেক নির্মম হয়েছি, ঘটনা হিসেবে প্রথম প্রেমপত্র পাওয়ার অভিজ্ঞতাকে মনে হয় অবান্তর ও রীতিমতো হাস্যকর।

কিন্তু, মনে রাখতে হবে সেই বয়সটাকে, প্রেম বলে কোনো শব্দ বা শব্দের অর্থ যখন ব্যক্তিগত অভিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রমণীদের সম্পর্কে জ্ঞান ছিল নিতান্তই অপরিপক্ক ; রমণীয় স্মৃতি বলতে বোঝাত মা-মাসীর পরনের চওড়া লালপাড়ের শাড়ি বা শাড়ির আঁচলে চকিতে-চোখে-পড়া বিচিত্র হলুদের দাগ। বয়সে যারা ছিল

কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে, তারা কোনো সম্মোহন জাগায়নি বললে মিথ্যে বলা হবে—কিন্তু সে-সম্মোহনও সীমাবদ্ধ ছিল পরনের রঙে, কিংবা, বিনুনির ঢঙে ; মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যূহ ভেদ ক'রে তথাকথিত হিন্দী ছবির নায়িকার মতো হাইহিল জুতো পায়ে কখনো অন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ পায়নি তারা। সমবয়সিনীরা ধর্তব্যেই আসত না। রঙীন ফ্রকের নীচে চোখে পড়ত তাদের অপরিসর অপরিচ্ছন্ন হাঁটু, নিজের সুপিরিয়রিটির অহমিকা সচেতন-ক'রে তুলত সঙ্গে সঙ্গে।

মানসিকতার এ হেন দুঃসময়ে তার আগমন প্রায় লেজ উঁচিয়ে এঁড়ে বাছুরের তেড়ে আসার মতো। আগমন না বলে আবির্ভাব বলাই সঙ্গত হবে।

অভিজ্ঞজনেরা জানেন, কিশোর বয়সে প্রেমে পড়ার নিকটতম সোর্স হলো পাশের বাড়ি। প্রেয়সী যদি নিজের সীমানার মধ্যে না থাকেন, তাহ'লে আর আশা নেই। অর্থাৎ, তিনি ছাদে উঠলে গৃহস্থের উঠোন থেকে আর কিছু না হোক, কার্নিশের স্বল্প পরিসরে যেন চোখে পড়ে তাঁর শিথিল পদচারণা ; কিংবা এলায়িতে কেশদাম। কল্পনায় খুব বেশি টান না পড়লে স্বল্প পুঁজি সম্বল ক'রেই তখন উঠোন থেকে অনায়াসে পৌঁছুনো যায় ছাদে। আর কল্পনার দৌড় বেশি হলে তো কথাই নেই, মনের মধ্যে বাচ্চা ভেড়ার মতো শিং দুলিয়ে নৃত্য শুরু করবে রবি ঠাকুরের বামন এডিশন। চিন্তার গতি শব্দের চেয়েও বেশি ; অসার কল্পনা আরও দ্রুতগামী। তার গতি রোধ করবে কে !

এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা অতোদূর গড়ায়নি ; চাকরিতে বদলি হ'য়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক সপরিবারে ; তাঁরই কন্যা। মফস্বল শহরে নতুন কেউ এলে যা হয়, কে আগে আলাপ জমাতে পারে তাই নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। আমরা ছিলুম নিকটতম প্রতিবেশী, সুতরাং, সৌভাগ্যই বলতে হবে।

সৌভাগ্য যে তা অবশ্য টের পাওয়া গিয়েছিল বেশ কিছুদিন

পরে। মানে, প্রেমপত্র পাওয়ার পর আর কি। কাক-পক্ষীও জানল না, মাঝখান থেকে আমি খেলুম ভিমি। চোখে আলো লাগল, সেই হঠাৎ-আলোয় নতুন ক'রে আবিষ্কার করলুম নিজেকে। স্মরণাতীত কাল থেকে গতকাল পর্যন্ত বিরল সৌভাগ্যবানদের তালিকায় নির্দ্বিধায় নিজেকে জুড়ে দিয়ে রাতারাতি একটা কেউকেটা বনে গেলুম। শুধু তাই নয়, যে আমি ছিলুম দুরন্ত দিনযাপনে অদ্বিতীয়, চঞ্চলতায় তৎপর—আমার স্বভাবেও দেখা দিল অচিন্তনীয়, প্রায় নারীসুলভ কমনীয়তা, আত্মমগ্ন পরিতৃপ্তির আভাস। দূর-সম্পর্কীয়া এক দিদি পাড়া বেড়াতে এসে আমার আদব-কায়দা, আচরণ ও বাকভঙ্গী দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন; এবং আমাকে 'বোকা', 'মেয়েলি' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করতেও তাঁর বিবেকে বাধল না।

হায়, হতভাগ্য আমি! যাঁকে নিয়ে আমার এই বিবর্তন ও পরিবর্তন, তিনি কিন্তু নির্বিকার। পরম ঔদাসীন্যে, সুস্থির চিত্তে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—যেন এমনটাই হবার কথা ছিল।

প্রেম মানে কি পারস্পরিক রহস্যের প্রতি আকর্ষণ? তাই হবে। না হ'লে হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তাঁর প্রেমেই বা পড়তে যাব কেন! রহস্য ছিল তাঁর সবকিছুতেই, চলনে, বলনে, প্রেক্ষণে, গ্রীবা-হেলনে, এমন কি লেহনেও। একদিন দূর থেকে দেখেছিলুম তাঁকে হাতের তেলোয় আলগোছে জিব বুলিয়ে আচার খেতে—অপূর্ব সে ভঙ্গিমা, অন্তত তখনো পর্যন্ত আমার স্মৃতিতে যা ছিল অভূতপূর্ব। যেন তার মধ্যেও ছিল রহস্য, অম্ল-মধুর আস্বাদ-গ্রহণের এক বিচিত্র পদ্ধতি। সেই কি আমার ভালো লাগার শুরু? হয়তো। অন্তত তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা যে আমার মনে অদ্ভুত অনুরণন তুলেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। সারাদিন আচ্ছন্ন হয়ে থাকল মন, না পারি ফেলতে—না পারি গিলতে, সে এক দুঃসহ

অবস্থা! অনেক গলদ্‌ঘর্ম যন্ত্রণার শেষে পথ খুঁজে পেলুম, রাত্তিরে পড়ার বই নিয়ে বসে। বেঙ্গলী সিলেকশনের পাঠ্য কবিতার ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বেরিয়ে এলো আত্মবেদনায় ভাস্বর পদ্যের কয়েকটি ছত্র :

তোমার মুখ কেবলই মনে পড়ে
যখন তুমি একলা একলা ঘরে
মনের সুখে গ্রহণ করো আচারে।
আমার তখন ইচ্ছে করে মনে
ঘুরে বেড়াই তোমাব সনে সনে
আমি এক হতভাগ্য বাছা রে॥

অনেক কাটাকুটির পর এক দাঁড়ি তু' দাঁড়ির যে-পদ্য অবশেষে বেরিয়ে এলো, সযত্নে তা ফেয়াব ক'রে টুকে রাখলুম সাদা কাগজে— সন্দেহ নিরসন না হওয়ায় সেটা স্থানান্তরিত হলো বুক-পকেটে। 'বাছা রে' শব্দটি সম্পর্কে মন খুঁতখুঁত করল অনেকক্ষণ, মানানসই তেমন কোনো শব্দ ধরা দিল না। শুধু তাঁর জন্যে নয়; বোধহয় সেই প্রথম শব্দ ও কবিতা সম্পর্কে ক্লেশ অনুভব করলুম—সমস্ত রাত্রির বিচ্ছিন্ন নিদ্রায় নিশ্বাস পড়তে লাগল সক্রিয়ভাবে, প্রতিশব্দের জন্যে হাহাকার করেও ফল হলো না কোনো।

প্রেম ও কবিতা যে পরস্পরের পরিপূরক এটা হৃদয়ঙ্গম করেছি পরে; অর্থাৎ, বাতিক ছুটে যাবার পর, বয়সকালে। কেউ লিখে ফেলেন অত্বর, কেউ ব'সে থাকেন গোঁজ হয়ে; কিন্তু অনুভূতির নরকে উভয়েই সমপাপী। প্রেমে পড়েও কবিত্ব এড়িয়ে গেছেন সাবধানে, মহাপাপের এমন ব্যতিক্রম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। প্রেমের প্রকৃষ্ট লক্ষণ দ্রবীভূত হৃদয়, পরে যা পরিণত হয় সুস্পষ্ট বিগলিত-ভাবে। আর সেই ভাবের গন্ধময় আকর্ষণে চিটে গুড়ে মাছির মতো কবিত্বও উড়ে এসে জুড়ে বসে। কালে প্রেমও হয়তো ছুটে যায়, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের ভঙ্গী ক'রে সরে পড়ে; কিন্তু, যায় না কবিত্ব, নতুন শূন্যতা জুড়ে সে তার কায়েমী স্বত্ব গুছিয়ে

নেয়। এক প্রেম যায়, কিন্তু বিশ্বের প্রেম ঢুকে পড়ে প্রেমিকের বুক ও মগজের ফাঁক-ফোঁকরে। পাখি উড়ে গেলেও খাঁচার দুয়ার থাকে অনর্গল। প্রেমিকের এই অন্তহীন পাখি ধরার অভ্যাস আছে বলেই কবিতা আছে এবং আবহমান কাল ধ'রে। দান্তে ছুটেছিলেন বিয়াত্রিচের পিছনে পিছনে নরক ও শুদ্ধিলোকের বিপত্তি পেরিয়ে স্বর্গলোক পর্যন্ত। কালিদাস সম্পর্কে আমাদের জানা খুবই কম: কিন্তু, আমি নিশ্চিত, মেঘদূত-এর উৎসও কিছু কম রহস্যময়ী নন। ব্যতিক্রম আমি; আমার হলো না।

কবিতা তো লেখা হলো; কিন্তু জ্বর কমল না। অসহনীয় আগুনে তুষের মতো জ্বলে-পুড়ে মরি আমি; কিন্তু নির্দয় প্রেয়সী আমার, তাঁর উৎপাত কমে না। ক্রমান্বয়ে আসতে লাগল তাঁর চিঠি, কখনো ডাকে—খামের ভিতর নীল প্যাডের কাগজে, কখনো বা গল্পের বইয়ের ফাঁকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ফাঁপরে পড়ে আমি তখন পড়তে শুরু করেছি নানা রসের নভেল, তার বেশির ভাগই ছিল আদিরসে টইটম্বুর। এ-ব্যাপারে আমার পরামর্শদাতা ছিল বার কয়েক কলকাতা প্রত্যাগত জনৈক সহপাঠী। সে-সব বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে আমার অব্যবহিত পরিচয় ছিল কম; কিন্তু প্রেয়সী ছিলেন তাদের সমধর্মী, ধ'রে নিয়েছিলুম তাতেই আমার সুখ। বইয়ের পর বই গেল তাঁর কাছে, ফিরে এলো দূত রূপে। হায়, আমার কাজ এগলো না।

প্রেমপত্র এলো, উত্তর গেল না। প্রতিদিনই খসড়া করি, ভাবি, আক্ষেপ ও অন্তর্জ্বালায় বিক্ষুব্ধ হই; কিন্তু পদ্য যতো সহজে এসেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি পরিশ্রম সত্ত্বেও উত্তর এলো না। তাহ'লে কি উত্তরে আমার লেখার কিছু নেই? তাঁর ছলাকলার কাছে বার বার পরাভূত হয়েও সে-সবের কিছুই কি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না? দুশো গজ দূরত্বে থেকেও যিনি পারেন ডাক-বিভাগের সাহায্য নিতে, নিকটতম দূরত্বে স্বল্প সময়ের অবস্থানে যাঁকে নিবেদন করতে পারি

না কোনো ভাষা, যার সান্নিধ্যে মূক হয়ে যাই সঙ্কোচে, 'ভালোবাসি' এই কথাটি কি কোনোদিন জানাতে পারব না তাকে।

দিন গেল, মাস গেল, বছরও গেল। পড়লুম ষোলোয়। আকস্মিক যৌবনের রোমাঞ্চ অনুভব করলুম সারা শরীরে; ঠোঁটের ওপর দেখা দিল পুরুষোচিত রেখা; কণ্ঠস্বর কর্কশ হলো আরও, পরিবর্তন দেখা দিল বেশবাসে। প্রেমপত্র লেখা হলো না। একদা প্রত্যূষে সানাইয়ের সুর স্তব্ধ ক'রে দিল আমার সমস্ত বেদনা। অতর্কিত আবির্ভাবে যে ক'রে দিয়েছিল সবকিছু অবিন্যস্ত, সে চ'লে গেল নিঃশব্দে, কোনো দাবি না জানিয়ে।

সে-প্রেমপত্র আজও লিখে উঠতে পারিনি।

১৬

* * *

সন্ধ্যা নামবার একটু পরেই মেয়েটি এইখানে এসে দাঁড়ায়।

শহর কলকাতার বিপন্ন আলোগুলো একসঙ্গে জ্ব'লে ওঠে হঠাৎ, বিপুল এই নগরীকে হঠাৎ মনে হয় দক্ষ জাদুকরের ভোজবাজির মতো —মুমূর্ষু বিকেলের মৃতদেহের ওপর কেউ যেন কালো চাদর বিছিয়ে দিল, মৃতের স্মরণে একটি একটি ক'রে জ্ব'লে উঠল অসংখ্য মোমবাতি। তারপরেই শুরু হয় খেলা, মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের অদ্ভুত চমকপ্রদ খেলা। ক্ষণিক স্তব্ধতার পর এক লহমায় আবার সব কিছু হয়ে ওঠে জীবন্ত। ট্রামগুলি আর বাসগুলি পাল্লা দেয় পরস্পরের সঙ্গে, ট্যাক্সি, মোটরের গতির তাৎপর্য বেড়ে যায়—ব্যস্ত মানুষজনকে আর তেমন ক্লান্ত মনে হয় না।

মেয়েটি যে এ-সব লক্ষ করে তা নয়। হয়তো করে না।

অন্তত তার চোখ-মুখের দিকে তাকালে একটা লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীনতাই ধরা পড়ে। এই শহরের বিভিন্ন চলমান অস্তিত্ব কাজে অকাজে পেরিয়ে যায় বিভিন্ন আলোর স্তম্ভ ও ট্রাফিক, অন্ধকার ও আলো। মেয়েটির স্থির, নির্বিকার চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, হয় সে সবকিছুই দেখছে, কুকুর যেমন আঁস্তাকুড় দেখে সেই তীব্রতা নিয়ে; না হয় কিছুই দেখছে না।

সম্ভবত দ্বিতীয়টাই সত্যি। অন্তত গল্পের প্রয়োজনে তো বটেই।

না হ'লে সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গেই যে-শহর অফিস-ফেরত বাবুকে-খুশি-করা মধ্যবিত্ত স্ত্রীর মতো দুপুর বিকেলের সমস্ত হাই-তোলা ভুলে চমৎকার সেজে ওঠে—সান্ধ্য শহরের সেই মোহিনী রূপ থেকে গল্পের নায়িকা ছাড়া আর কে চোখ ফিরিয়ে থাকবে।

কিন্তু, এই মেয়েটি সম্ভবত কোনো গল্পের নায়িকা নয়।

মুহূর্তের ছকে ফেলা যে-কোনো একটি দিনের ঘটনাও নয়।

প্রতিদিন, প্রায় একই সময়ে, প্রায় একই জায়গায়, সর্বাঙ্গে ঋতুবন্ধের অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধের বিজ্ঞাপন সাঁটা টেলিফোন লাইনের ঢাউস বাক্সটার গা ঘেঁষে, সন্ধ্যা নামবার একটু পরেই মেয়েটি এসে দাঁড়ায়।

দাঁড়িয়েই থাকে। কারও বা কিছুর, অর্থাৎ বাস, ট্রাম কিছুর, অপেক্ষার ধরনে নয়; নিতান্তই দায়সারা, নিরভিসন্ধিমূলক অবস্থান। অনেকেই তার দিকে চোখ ফেলে, কিন্তু সে কাউকে দেখে না—এমনকি নিজেকেও নয়। ভাব দেখে মনে হয় সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশের পরিবেশ শীতের দুপুরে পাড়াগাঁর মাঠের মতো নির্জন এবং স্তব্ধ!

অথচ, নির্জন যে নয়, তা বলার দরকার করে না। কারণ, এটা কলকাতা শহর, যেখানে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কোনো মানুষই একা নয়, কোনো জায়গাই নির্জন নয়। আর স্তব্ধতা তো নেই-ই।

এই মেয়েটি সত্যিই এক রহস্য! শারীরিক উপস্থিতিটুকু বাদ দিলে তার মধ্যে লক্ষণীয় এমন কোনো চরিত্র ফুটছে না, বা তাকে ঘিরে এমন কিছু ঘটছে না, যার ওপর নির্ভর ক'রে মেয়েটি সম্পর্কে যা-হোক কিছু ভেবে নেওয়া যায়।

ব্যাপারটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে-কোনো লেখকের অভিজ্ঞতাতেই দেখা দেয় বেপরোয়া ও আজগুবি কিছু ঘটনা, গল্পের গরুকে গাছে তোলবার আগেই যারা গোড়া কাটবার জন্যে কুড়ুল হাতে ছুটে আসে। যাদের শেষ ভাবতে গেলে শুরু মেলে না, বা শুরু মিললেও এগুনো যায় না।

মেয়েটি বোধহয় শেষোক্ত ধরনের। তার সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা এইরকম—প্রতিদিন কলিকাতা শহরে যখন সন্ধ্যা

নামে তখন একটি মেয়ে ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে কোনো একটি বিশেষ স্থানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

আর কিছু নয়।

মেয়েটির চেহারার বর্ণনা দিলে কি কিছুর হদিস মিলবে?

অসাধারণত্বের ছিঁটেফোঁটাও নেই তার চেহারায়। আটপৌরে, অপুষ্ট গড়ন, দেখলে মনে হয় একটা বিশেষ বয়সের পর মেয়েটির শরীর তার নিজের নিয়মে বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে কেউ কেউ সুষমা পায়, পায় কিঞ্চিৎ লাবণ্য। মেয়েটি কিছুই পায়নি। উপরন্তু, তার রঙ ময়লা; অর্থাৎ, একটু মাজা-ঘষা করলে যা হয়তো শ্যামে দাঁড়াত। মাথায় একটি আলগা বেণী। বেণী দেখে মনে হয় চুলও আছে প্রচুর, কিন্তু চুলে বাহার নেই কোনো। নাক ঈষৎ চাপা হ'লেও মুখের ডৌলটুকু সুন্দর। চোখ দু'টি খুব সাধারণ আর সরল, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় একদিন ঐ চোখে মেয়েটি সুন্দর কাঁদতে পারত।

এই শহর তার কাছে নতুন ও অনাবিষ্কৃত নয়—এটা মনে হয় তার নির্ভাবনায় দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে। না হ'লে, আপাতদৃষ্টিতে যে-কেউ তাকে সরল গ্রাম্য যুবতী ব'লে ভুল করতে পারে। চেহারায় চটক নেই, সাধারণ আটপৌরে শাড়ি-জামায় কোনোরকমে অর্ধপুষ্ট শরীরটা ঢেকে এখানে এসে দাঁড়াবার জন্যেই যেন তার যতো ব্যস্ততা।

প্রতি সন্ধ্যায় একই জায়গায় একই ভাবে এসে দাঁড়ানোর যুক্তিটা কি? বা, মেয়েটি কোথা থেকে এসে কোথায় চ'লে যায়? কেন আসে?

ঠিক বোঝা যায় না; হয়তো এইসব প্রশ্নের মধ্যেই আছে নিটোল একটি গল্পের আভাস।

তাকে কোনো যুবকের প্রণয়িনী হিসেবে কল্পনা করা যাবে এমন আশা দুরাশা মাত্র। তাহ'লে তার চোখে থাকত অপেক্ষার দীপ্তি,

আচরণে চাঞ্চল্য, মণিবন্ধে ঘড়ি না থাক, অন্তত সময় কতো জানবার জন্যে ফুটপাথের কোনো দোকানের ঘড়িতে চোখ রাখতে হতো।

না, সে কারও প্রেমিকা নয়।

মেয়েটি সম্পর্কে আরো কিছু ভাবা যায়। এই শহরেই অসংখ্য মেয়ে দশটা পাঁচটা অফিস যায়, কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম তাদের ক'রে ফেলে ক্লান্ত, তখন শুরু হয় তাদের কোনোরকমে ভিড়ের ট্রামে-বাসে শরীরটা সেঁধিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার বা বিশ্রামের প্রাণান্তকর চেষ্টা।

এই মেয়েটির অস্থির আচরণ সে-রকম কিছু ভাববার সুযোগ দেয় না। সে নিশ্চেষ্ট, এবং নিশ্চিন্ত না হলেও, নিরুদ্বিগ্ন।

তাহ'লে কি মেয়েটি অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

হ'তে পারে। খুবই সম্ভব, তার বৈশিষ্ট্যহীন বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়েই সে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। মেয়েটির উদাসীন নিরপেক্ষতা একটি ছল মাত্র। ছলনাই তার উপায়।

আমরা বোধহয় একটি গল্পের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

ধরে নেওয়া যায় মেয়েটি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেইভাবেই আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো অনেকক্ষণ। কারণ, সময়ের চেয়ে তার প্রয়োজনের মূল্যই বেশি।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউ কেউ লক্ষ করবে তাকে। যারা আর একটু সাহসী তারা ঘুরে যাবে তার আশপাশ দিয়ে, জিহ্বায় জোর দিয়ে কাশবে, নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে জুতোর হিলে শব্দ তুলবে ঠুকঠুক ক'রে। তারপর চ'লে যাবে। কারণ, এর বেশি সাহস তাদের নেই। মেয়েটি দাঁড়িয়েই থাকবে।

তারপর একটি লোক আসবে; যে-কোনো বয়সের, যে-কোনো চেহারার একটি মনুষ্য। লোকটির শরীরে চোখে ও অভিব্যক্তিতে জান্তব ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই নেই। মেয়েটির সামনে, প্রায় গা-ঘেঁষে লোকটি এমনভাবে এসে দাঁড়াবে, যাতে মনে হবে এই মানুষটির জন্যেই সে এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

এতোক্ষণ মেয়েটির মধ্যে যে উদাসীন তন্ময়ভাব লক্ষ করা গিয়েছিল, এইবার তা ভেঙে পড়বে। দু'জনের মধ্যে অশ্রুত কোনো বাক্য-বিনিময় হ'লেও হ'তে পারে। তারপর মেয়েটি অনুসরণ করবে লোকটিকে।

মেয়েটিকে ইতিমধ্যেই আমরা খারাপ ভাবতে শুরু করেছি।

সে যাই হোক, লোকটির সঙ্গে মেয়েটি যে-কোনোভাবে যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে, যে-কোনো শর্তে। এতোক্ষণ সে ছিল নিজের খেয়ালের পুতুল, এইবার লোকটির হাতের ; লোকটি তাকে নিজের খুশিমতো ব্যবহার করতে পারে।

সেই ব্যবহারের পদ্ধতিও এমন কিছু নয় যা আমাদের কল্পনার বাইরে। খাদ্য আর খাদকের সম্পর্কে কে আর কবে দূরত্ব দেখেছে।

ভূমিকা হিসেবে এখন শুধু দরকার একটু নির্জনতার, সহনীয় একটু আড়ালের।

হয়তো একটি ঘর। ঘরটি মেয়েটির নিজস্ব হ'লেও ক্ষতি নেই ; এমনও হ'তে পারে, লোকটিই তা যোগাড় করেছে। ঐ ঘরে একটি তক্তপোষ আছে, তক্তপোষের ওপর একটি বিছানা। বিছানার ওপর মেয়েটি ও লোকটি বসে। এরপর কী ঘটবে ও কতো দ্রুত তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে লোকটির প্রয়োজন কতো তীব্র তার ওপর। তবু, শেষ পর্যন্ত, মেয়েটি একে একে তার সব আবরণ খুলে ফেলবে—শাড়ি, জামা, হয়তো গলির দোকানে কেনা এক টাকা দামের সস্তা ব্রেসিয়ারটিও। এই মুহূর্তে তার যেটুকু দাম তা ঐ নগ্নতার জন্যেই। লোকটি চ'লে যাবে তার শরীরের প্রয়োজন মিটিয়ে। যাবার আগে আলগোছে মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দেবে সুখ-সংগ্রহের দাম, মেয়েটির জীবন-যাপনের উপায়।

পরদিন আবার মেয়েটি এসে দাঁড়াবে—সেই একই জায়গায়, সেই একই সময়ে, একই রকম উদাসীন, চরিত্রহীন বিষণ্ণতা নিয়ে। বড্ডোই পুরনো ব্যাপার।

এই পুরনো, বস্তাপচা গতানুগতিকতার ছকে ফেলে মেয়েটিকে ঠিক চেনা গেল না। এর সবটাই তো আমাদের আরোপিত।

আর, বেশ্যাবৃত্তিই যদি তার লক্ষ্য হতো তাহ'লে ঐ নির্বিকার উদাসীনতার প্রয়োজন ছিল না কোনো—সে চলত পরিষ্কার নিজের নিয়মে, এই শহরের অসংখ্য গণিকা যেভাবে চলে। বরং তার জীবিকাই ব'লে দিত, উদাসীনভাবে আর যাই হোক, শরীরের প্রয়োজন মেটানো যায় না; সময় ও স্থানের নির্দিষ্টতায় সে তাহ'লে নিজেকে বেঁধে রাখত না।

হয়তো তার সবকিছুর ভিতরেই আছে আরো গভীর কিছু, যা আমরা বুঝতে পারছি না। যে-অতলতার রহস্য একমাত্র মেয়েটিই উদ্ধার করতে পারে।

দেখছি, শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে নিয়ে কোনো গল্প দাঁড় করানো গেল না।

১৭

দশমীর দিনে বিসর্জনের বাজনার মধ্যে অনেকেই অনেক রকম মুখ দেখেন ; তার কোনোটাই আনন্দের নয়। দুঃখ বা শোকের কী ? সম্ভবত নয়। দুর্গা পুজোটা যেহেতু বিশেষভাবেই বাঙালীর পুজো, তাই এর সঙ্গে জড়ানো সমস্ত অনুভূতিগুলিই জড়িয়ে আছে বাঙালীর রক্তে। অবশ্য তাঁদের কথা আলাদা, যাঁরা বাঙালী হয়েও বাঙালী নন ; কিংবা বাঙালীর নিজস্ব বোধ, অনুভূতি ও দুর্বলতাগুলোকে আলাদা করে চিনে নিতে দ্বিধা বোধ করেন। অন্য সকলের কাছেই, মনে হয়, দশমী বুঝতে-না-পারা শোক, চিনতে-না-পারা দুঃখ আর ছেঁড়াখোঁড়া স্মৃতি—যার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে ধারাবাহিকতা খুঁজতে গেলে মন শুধুই হয়ে ওঠে ভারাতুর। ভরে ওঠে এক ধরনের কেমন-করা শূন্যতায়। আনন্দের হাত ধরে দুঃখের আবির্ভাবের এমন উপলক্ষ আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

দশমীর দুঃখের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা মনে নেই বলেই হয়তো যে-কোনো হারাই-হারাই মনোভাব ও মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে দশমীর বাজনা। আমার পড়াশুনো কম, ওরই মধ্যে খ্যাত অখ্যাত, বড়ো বা ছোটো বাঙালী ও বাংলা ভাষার লেখকদের যেটুকু লেখা পড়েছি, দেখেছি, প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের আবেগ ও বর্ণনায় কখনো-না-কখনো, কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে গেছেন দশমীর অনুষঙ্গে। একই ভাবনা জড়ানো আমাদের লোকগানে এবং পুরানো কথায়। চলচ্চিত্রে বা নাটকে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই ভাবটা ঘুরে ফিরে আসে আবহসঙ্গীতের ভাব ও ব্যঞ্জনায়। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে মা ও মেয়ের মনে,-প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদে, মৃত্যুর

ভাবনা থেকে মৃত্যুদৃশ্যের মাঝখানে, দাম্পত্য কলহের দীর্ঘসূত্রতায়, দুঃখের স্মৃতিতে এবং এমনিতরো আরো অনেক প্রসঙ্গে—এমন কি প্রসঙ্গহীন নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেও, দশমীর ভাবনা আমাদের ঠেলে দেয় অনুভূতির খুব কাছাকাছি। আর, আশ্চর্য, এতো ব্যবহারেও এর ব্যবহার মলিন হয় না কখনো।

কেন যে এমন হয় কে বলবে! তা কি শুধুই দশমী উৎসব-শেষের স্মারক বলে? মনে তো হয় না।

এই ব্যস্ত সমস্ত কাজকর্মে ভণ্ডুল ও এলোমেলো আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত উৎসবের কম নেই কোনো। যাঁদের টাকা-পয়সার জোর আছে, সেই জোরেই যে-কোনো সময়ে তাঁরা কিনে নিতে পারেন উৎসব। এরই বাহ্যিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে, বিবাহ বার্ষিকী পালনে, পিকনিক কিংবা অন্য কোনো সূত্রে, কিংবা নিছকই ট্রেনে কিংবা প্লেনে চড়ে বেড়িয়ে বেড়ানোয়। সেগুলির শেষে প্রত্যাশা থাকে, বেদনা থাকে না কোনো। কিংবা, থাকলেও, তা কি দশমীর বিষণ্ণতা বোধের সঙ্গে তুলনীয়? উৎসবের এইসব উপলক্ষের পুনরাবির্ভাবে নিশ্চয়তা থাকে না কোনো; দুর্গাপুজো বরং অবধারিত। একবারের উৎসব শেষ হতে না হতেই পরের বারের দিনক্ষণটি জানিয়ে দেয় পাঁজি। বিদায়ই জানিয়ে যায় পুনরাবির্ভাবের বার্তা।

তবু সে-আবির্ভাবের সম্ভাবনায় মন ভরে না। আবেগ তো নয়ই। বরং দশমী যেন সব আশা ভরসা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশায় ঠুলি পরিয়ে একমাত্র নিজেকেই করে তোলে অদ্বিতীয়। এই যে হাসিমুখে চলে গেল সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—শিশুদের কোলাহল থেকে এখনো যায়নি নতুন জুতো জামার গন্ধ, তরুণী যুবতীদের শিথিল কবরী সতৃষ্ণ হয়ে আছে পুজোর হাওয়ার দিকে, আনন্দিত রাত্রি জাগরণে আরক্ত-চোখ তরুণ ও যুবকেরা এখনো ভাবেনি হাত-পা ছড়ানোর কথা এবং মণ্ডপে মণ্ডপে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত দেবী দশভুজা—এই তিন দিনের

সম্মিলিত প্রভাব অন্তর্হিত হতে পারে দশমীর আবির্ভাবের ধমকে। প্রকৃতির আচরণে অন্যান্য দিনের চেয়ে কোনো তফাত চোখে না পড়লেও মনই তাকে সাজিয়ে নেয় একটু অন্য রকম করে। মনে কি হয় না, হাওয়ায় লেগে আছে ভিজে পাতার ছোঁয়া, রোদ্দুরে মিশে গেছে হঠাৎ মেঘের ভাবনা, আর শীতের চোরা আক্রমণে জড়িয়ে যাচ্ছে শরীর? অলস মনের উপসর্গ নিয়ে মনে কি হয় না, এই পুজো আসছে পুজো আসছে ভাবটাই ভালো—কিংবা গোটা উৎসবটাই একটা বিষাদের মোড়ক, আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে হঠাৎই তার প্রবল শূন্যতা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে দশমীর ভোরে, বিচ্ছিন্ন ঢাকের শব্দে। সেই শব্দ থেকে যায় দশমী ছাড়িয়েও পরের দিনগুলিতে, ছাই-ওঠা আলস্য থেকে যতোদিনে না আবার আমরা ফিরে যাই দিনযাপনের গতানুগতিকতায়।

অনুভূতির গভীরতায় তফাত থাকতে পারে, সত্যে নয়। ভাবছি, আমাদের এই বাঙালী জীবনে দশমী কি শুধুই উৎসব-শেষের স্মারক, নাকি দশমীকে ঘিরে আমাদের চিন্তার ভিতরে থাকে আর কোনো উপলক্ষ—গোটা বছরের বিস্মরণ থেকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো যে বিস্ফারিত হয় এই একটিই দিনে! দশমী কি স্মৃতি জাগানোর দিন, কিংবা নিজের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকানোর, কিংবা প্রাত্যাহিক ব্যস্ততা, কর্মচাপ ও স্বার্থপরতায় ধুলোমলিন ও অস্পষ্ট স্মৃতি ও সম্পর্কগুলিকে নতুন করে ফিরে পাবার কিংবা হারানোর আশঙ্কার। যুক্তি হয়তো সায় দেবে না; কেউ কেউ এটাকে অকারণ ভাবালুতাও ভাবতে পারেন। কিন্তু, সত্যিই যদি তাই হতো, আবছায়ার আড়ালে দুলে না উঠত মন, তাহলে এই দশমীর সূচনাতেই আত্মীয়-বন্ধুদের ঠিকানা খোঁজার জন্যে তোড়জোড় পড়ত না। সভ্যতার দায়ভার বহন করতে করতে ইতিমধ্যেই আমরা বর্জন করেছি অনেক সংস্কার, কিন্তু দশমীতে বিজয়ার চিঠি লেখার সংস্কার কি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি আজও? এই মুহূর্তে প্রিয়জনকে-

প্রীতি, শুভেচ্ছা বা প্রণাম পাঠানোর মধ্যে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানানোর সদিচ্ছা ছাড়াও হয়তো থাকে আরো অনেক কিছু— থাকে বস্তু-পৃথিবীর ক্রমাগত আঘাতে বিচূর্ণ আমাদের সম্পর্কগুলোকে জোড়া লাগানোর বা কাছে টেনে আনার প্রচেষ্টা। লিখতে গিয়ে মন কাঁপে, হয়তো হাতও। কখনো বা মনে হয় এবার এখনো পারছি, আগামী দশমীতে এই ঠিকানাটা হারিয়ে যাবে না তো? নিজের অজ্ঞাতে পাপ-পুণ্য অপরাধবোধগুলো হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ। লোকচক্ষু বুঝতে পারে না কখন হয়ে পড়েছি নতজানু।

কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান

কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান—এই নিয়ে আমি; আমার লেখাও। পৃথিবীতে মানুষের পারম্পর্যহীন জন্মলাভের ধারাবাহিকতায় এক অতি সাধারণ পরিবারে আমার জন্ম; আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে, বিহারের ভাগলপুর শহরে। হিসেবমতো অর্ধেক বয়স পেরিয়ে এলেও, একজন লেখকের পরিপূর্ণতা অর্জনের পক্ষে সাঁইত্রিশ কি কোনো বয়স? জানি না। তবে আত্মজৈবনিক বা আত্ম-সমালোচনামূলক কিছু লেখার পক্ষে তো নয়ই। বিশেষত, সে যদি হয় আমার মতো কেউ, নগণ্য; অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো সম্পাদক কর্তৃক হঠাৎ একদিন যে আবিষ্কৃত হয়নি, বা আদিষ্ট হয়নি একটি উপন্যাস লিখে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যকে চিরঋণী করে রাখার জন্যে; যে নয় পুরস্কৃত, প্রকাশমাত্র যার বই সংস্করণধন্য হয় না। আত্মপ্রচার বা প্রতারণার জন্যে প্রকৃষ্ট এই সব উপায়ের কোনোটিই যার অধিগত নয়, সে শুধু তাকাতে পারে তার নিজের দিকে—ভারাক্রান্ত, কিছু বা অন্যমনস্ক চোখে; ঝকঝকে কাচের টেবিলে অস্পষ্ট লেগে-থাকা চায়ের দাগের দিকে যেভাবে তাকাতে হয় কখনো কখনো। অস্পষ্টতার ভিতর থেকেই তখন ক্রমশ জন্ম নেয় এক বিশাল ও ব্যাপ্ত জগৎ—যেখানে রূপকথার জগৎ উন্মোচিত হবার আগেই থমকে যায় একটানা ঝিঁঝির ডাকের স্তব্ধতায়; যেখানে, প্রতিভা, প্রেরণা, প্রতিবদ্ধকতা ইত্যাদি গালভরা কথার মূল্য নেই কোনো; যেখানে শুধুই স্মৃতি—এক ও অসংখ্য; জলে জল লেগে থাকার মতো জড়িয়ে আছে পরস্পরকে।

আমি বিশ্বাস করি এ-অভিজ্ঞতা আমার একার নয়, নিশ্চিত

আরও অনেকের। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো খটখটে টিউবওয়েলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক যে-যুবকটির হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার সমস্ত জ্বালার কেন্দ্রে আছে তৃষ্ণা, অথচ জল নেই কোথাও, তার ; প্রয়োজন সত্ত্বেও ভিক্ষা চাইতে পারে না! বলে প্রতিনিয়ত যে ঈর্ষা করে যায় ভিখারিকে, তার ; প্রাণপণ আবেগ ও সততা নিয়েও শুধু পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধতায় যে প্রত্যাখ্যাত হলো, তার ; তাদের এবং এমনিতরো আরও অনেকের। সাধারণ, অতি সাধারণ, এই সব মানুষ ও চরিত্রের সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত যে-আমি ব্যক্তি তার পার্থক্য ছিল না কোনো। কিংবা, থাকলেও ছিল একটি ; তারা লিখতে পারে না, আমি পারি। তাদের জন্যে আমার যতো সংকল্প ও প্রার্থনা কোনোদিনই কার্যকর হয়নি ; দুঃখ থেকে দুঃখে আরও পরিস্ফুট হয়েছে শুধু।

এইসব বোধ নিয়ে, এইভাবেই সম্ভবত শুরু হয়েছিল একদিন। শুরুর দিনে যেহেতু কিছুই ভাবিনি, সুতরাং, ঠিক তন্মুহূর্তের ভাবনাগুলিকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। আজ মনে হয়, লেখক হিসেবে পরিচিতি যদি কিছু এসেও থাকে, তা এসেছে অত্যন্ত অগোচরে ; সত্য যদি কিছু রেখে থাকে, তা অন্যদিকে—সেগুলো ভুলে যাবার কথা নয়। তার সবটারই প্রতিফলন যে পাওয়া যাবে আমার রচনায়, তাও নয়। লেখক-সত্তার ওপরেও কাজ করে লেখকের ব্যক্তিসত্তা, তার কৌমার্য ও অহঙ্কারবোধ, কিঞ্চিৎ অভিমানও। এ-সবের প্রভাব লেখককে শেখায় নির্বাচন। লেখক প্রজামাত্র। স্বসৃষ্ট এই একটি প্রজা নিয়েই ব্যক্তির রাজ্যপাট, তার শাসন-অনুশাসন, তার গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ভূমিকা। স্মৃতিকে সে আড়াল করতে পারে বিস্মরণ সাজিয়ে। তার অর্থ ভুলে যাওয়া নয়। আমিও ভুলিনি।

আমার একটি উপন্যাসের নাম 'আমরা'। তার নায়ক (?) প্রিয়নাথ মজুমদারের স্বচ্ছ অস্তিত্বের মধ্যে ক্রমাগত খেলা করে

চলেছে ব্যক্তি ও লেখক। বড়োই ভঙ্গুর তার স্মৃতি ; সে অনেক কিছুই ভুলে যায় ও গণ্ডগোল করে ফেলে। তার মনে থাকে শুধু একটিই বিষয় : অপমান। প্রিয়নাথ আর যে তাকে সৃষ্টি করেছে সে এক লোক নয় ; কিন্তু তার বুকে ও অনুভবে তার সৃষ্টিকর্তার হাতের ছাপ কি থাকবে না। বলছি সৃষ্টিকর্তা ; কিন্তু সে তো ঈশ্বর নয়, সেও যে মানুষ। এই মানুষটিকে গোটা পাওয়া যাবে তার মৃত্যুর পরে, প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে—যদি কেউ ইচ্ছে করে ; অনেক ভাবনা ও চরিত্রের ভগ্নাংশ জুড়ে জুড়ে। কারণ, লেখায় অন্তত সে সোচ্চারতায় কিংবা ঘটনার ঘনঘটায় বিশ্বাসী নয়, অনুভূতির প্রকাশে সংযমী। তার ঝোঁক দেখানোর চেয়ে বেশী আড়াল করায়। তার যতো কান্না সবই অশ্রুহীন, একা-একা।

যে-দুঃখ অনাটকীয়, যে-অপমান প্রলয় জানে না, যে-দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সংশয় ও বিবেকবোধ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যায় আত্মার ভিতরে, যে-কান্না সংযম মানে—আপামর মানুষকে ভিজিয়ে দেয় না চোখের জলে, যে-প্রেম তাকিয়ে থাকে, যে ভালোবাসা উচ্ছিষ্ট করে না, যে-সব কথা, শব্দ ও সংলাপ তাদের বহু-ব্যবহৃত আভিধানিক অর্থ ছাড়িয়েও যেতে চায় দূরে—আরও বেশী অর্থময়তার দিকে, তা নিয়ে কি সাহিত্য রচনা করা যায়? জানি না। শুধু এটুকু জানি, যদি না যায়, তাহলে ব্যর্থ শুধু আমার প্রচেষ্টাই নয়, ব্যর্থ আরও অনেক কিছুই, এমনকি আমার দেখা-শোনা-জানা চারপাশের মানুষ ও পারিপার্শ্ব, আমার ন্যায়, নীতি, ধর্ম বিষয়ে ধারণাও। প্রশ্নটা আমার নিজের কাছে নিজেরই ; এর উত্তরও সম্ভবত একদিন নিজের কাছেই পেয়ে যাব। ব্যক্তির পরিচয় নামে, লেখকের পরিচয় লেখায়। উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার কিছু নেই। লেখকের ত্রাণকর্তা সে নিজে, তার ঘাতকও সে নিজেই। সে নিজেই পারে নিজেকে ঝড়-জল-দুর্বিপাকে বাঁচাতে তার একমাত্র পাশুপত লেখা দিয়ে। যদি না পারে, অমোঘ মৃত্যুই তার জন্যে

নির্দিষ্ট। এই একটি ব্যাপারে অন্তত আমি নিয়তি মানি। এই মুহূর্তে জানি না আমার ভবিতব্য কী! যেদিন জানতে পারব, বা, যদি এমন হয়, 'মৃত্যুই আমারও—',এই বোধে জেগে উঠি সহসা, 'বিদায়' বলে চলে যাব। সে-ধ্বনি শুধু পৌঁছুবে আমারই কানে। কৃতজ্ঞতাবোধের সুযোগ যার নেই, সে নালিশ জানাবে কার কাছে! পাঠকের কাছে? যদি পাঠক থাকে—অন্তত একজনও, তাহলে তো লিখেই যেতে হয়!

এ-পর্যন্ত লিখে মনে হচ্ছে এ-সব হেঁয়ালির মানে হয় না কোনো। এর চেয়ে হাস্যকর লেখা এর আগে কখনো লিখিনি। কী নিয়ে লিখি, কী আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা—এ-সবের হদিস যদি আমার লেখার মধ্যেও ইতিমধ্যে না মিলে থাকে, তাহলে গদ্যাকারে এ-সব লিখে কাকে কী বোঝাবো! 'আমি' ও 'আমার' শব্দ দুটির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ইতিমধ্যেই নুয়ে পড়তে শুরু করেছে এ-লেখা লেখার আড়ালেই যে থাকতে অভ্যস্ত, তাকে আবার প্রকাশ্যে ডেকে আনা কেন! মনে পড়ে ছোটবেলার গল্প, স্কুলের এক সহপাঠীর কথা। মানচিত্র আঁকায় সে ছিল অপটু; রেখার টানে ছিল না সমতা, বাঁকগুলো প্রায়ই হয়ে যেত ভোঁতা। ভারতবর্ষ আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তফাত করা যেত না কোনো– এ নিয়ে ভূগোলের মাস্টারমশাইয়ের কাছে তিরস্কারও কম শোনেনি। এইভাবে, যখন কিছুতেই আর আঙুলের টান শোধরাতে পারল না, তখন সে বের করল এক অভিনব উপায়—মানচিত্রের নীচে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিত নাম: 'ভারতবর্ষ' বা 'অস্ট্রেলিয়া' বা 'আফ্রিকা', যাতে চেনা যায়। অনেকটা সেইরকম, এই যে আমি আমার লেখার বিষয়, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রাঞ্জল করার চেষ্টায় নেমেছি – নির্দেশ যেখান থেকেই এসে থাকুক, তা কি আমার ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা, না পাঠকের গ্রহণক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস? গোটা দশ-বারো উপন্যাস, প্রায় শ খানেক গল্প, শতাধিক কবিতা, কিছু প্রবন্ধ, আর

এ ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরও কিছু রচনার লেখক আমি ; নিজেই জানি সংখ্যাকীর্ণ এইমাত্র পুঁজির জন্যে ভবিষ্যৎ আমাকে শিরোপা দেবে না। আমার সমস্ত রচনার প্রথম পাঠক-ও-সমালোচক যেহেতু আমি নিজেই, সে-জন্যে যে-কোনো রচনার অপূর্ণতা, যদি থাকে, চোখে পড়ে আমারই আগে—বুঝতে পারি যা লিখতে চেয়েছি তার অনেকটাই লেখা হলো না। এই অস্বস্তি থেকেই বুকের আড়ালে জন্ম নেয় প্রতিজ্ঞা, ক্রটিহীন আর-একটি লেখার জন্যে দৃঢ় হয়ে ওঠে কলম। এই ভাবে গত দেড় যুগ ধরে চলেছে আমার শিক্ষানবিশী—শূন্য থেকে সংখ্যাতীতের দিকে। দেড় যুগ তো কম সময় নয়। মুদ্রিত রচনার যে-ফিরিস্তি দিলাম, পরিমাণেও তা খুব কম নয়। তবু, শূন্য থেকে শুরু হয়েছিল যে-যাত্রা, তা কি আজও শূন্যেই থেমে আছে? এ-প্রশ্নও আমার, নিজেরই কাছে।

বলেছি সাঁইত্রিশ বয়সটা কিছু নয়। কিন্তু, যখন ভাবি, এই বয়সে পৌঁছুনোর আগেই রচিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি রচনা, আমার অব্যবহিত পূর্বসূরীদেরও কারও কারও উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি রচনা ; কিংবা, ততো বেশী না হলেও ইতিমধ্যেই আমার গ্রন্থ-সংখ্যা সতীনাথ ভাদুড়ী কি··আরও একটু এগিয়ে—আলবেয়ার কামু বা সার্ত্র্‌র প্রায় সমান, তখন যুক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর মতো কোনো ভূমিই খুঁজে পাই না ; নিজেকে মনে হয় আরও ছোট। এই ক্ষুদ্রতার বোধই, এক অর্থে, আমাকে প্রতিনিয়ত শাণিত করে নতুন কোনো রচনার দিকে—অক্ষরে নিয়োজিত হয় আবেগ, শব্দ খোঁজে তাৎপর্য। মাকড়শার উদ্যমের মতো অবিরাম এই চেতনা, একটি জাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলেও, পরবর্তী জাল রচনাই যে তার নিয়তি।

লেখক হবার একটা বড়ো বিপদ, তাকে সারা জীবন প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়-এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সূর্যের সঙ্গে, যে-সূর্য অস্ত

যায় না কখনো, সারাক্ষণ শাসিয়ে রাখে দিবালোক সাজিয়ে—আসে না বেলা ফুরনোর নির্দেশ। যদি আসত, তাহলে মৃত্যুর আগেই আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতেন অনেকে, অন্তত পণ্ডশ্রমের জের টানতে টানতে অনাবশ্যক ন্যুব্জতা ও অপমানে লীন হবার দৈন্য থেকে বিরত থাকতেন। রসিকতা করে বলা যায়, এ সেই সুন্দরী প্রেয়সীর হাসি —যে তার অসংখ্য প্রেমিকের মধ্যে গ্রহণ করবে না কাউকেই, তবু সকলকেই টেনে রাখে ভুল ভালোবাসায়। যতোই ভুল হোক, প্রেমিকের কাছে অন্তত, এ ভালোবাসায় দম্ভ আছে, আছে অন্যদের চেয়ে নিজেকে প্রকট ও বিশিষ্ট ক'রে তোলার প্রচণ্ড ইচ্ছা। এই দম্ভই ক্ষোভে, অপমানে, কৃচ্ছ্রতায় তাকে বার বার দিয়ে যায় দীর্ঘ পুনরুজ্জীবন—হাতে কাগজ কলম যুগিয়ে চাবুক মারে মগজে। তখন লেখা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। মনে হয় প্রেরণা বলতেও কাজ করে এই আত্মবোধ—প্রাথমিক অভ্যাস থেকে যা ক্রমশ ঢুকে পড়ে রক্তে। বয়স বাড়ে, বাড়ে অভিজ্ঞতা ; ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অনুভূতি অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় মিশে পায় অন্যতর রূপ ও সমগ্রতা—প্রত্যক্ষের সঙ্গে যার সম্পর্ক সামান্যই। যাঁরা শুধুই লেখক নন, দ্রষ্টাও, তাঁরাই পারেন এর সঙ্গে জুড়ে দিতে আরও কিছু : তাঁর ব্যক্তিগত বিচারবোধ, ন্যায়, নীতি ও ধর্ম, তাঁর পক্ষপাত ও নিজস্ব অনুষঙ্গ, তাঁর বিশ্বাস-অবিশ্বাস। তাঁরা ব্যতিক্রম। সম্পাদক, প্রকাশক, গোষ্ঠী বা পাঠক-পাঠিকার তুষ্টিসাধনের চেয়েও আত্মদর্শন ও প্রবণতাই তাঁদের কাছে বিশিষ্ট : একক বা সম্মিলিত কোনো রুচি বা প্রত্যাখ্যান তাঁদের বিচ্যুত করতে পারে না স্বধর্ম থেকে।

ব্যতিক্রমের এই পর্যায়ে আমার স্থান কোথায় আমি জানি না। এ পর্যন্ত যা লিখেছি তার জন্যে প্রশংসা কিছু কিছু জুটলেও, নিন্দাও কম জোটে নি। এই সব প্রশংসা বা নিন্দার কতটা প্রকৃত মূল্যায়ন, কতটা হেলাফেলা, তা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত নই। আমাদের

চারপাশের পরিবেশ যেমন, তেমনি আমাদের সাহিত্যের জগৎও স্থূল বা সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যবর্জিত নয়। তবু, এরই মধ্যে দিয়ে মানুষ যদি প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্যে, আশ্রয়ের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে—যদি এ-সবের জন্যে তার লক্ষ্য থাকে সৎ ও একাগ্র, তাহলে, কাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও, লেখকই বা একলক্ষ্যে সৎ ও পরিশ্রমী হবেন না কেন! নিজের কাছে পরিচ্ছন্ন হবার আগেই যাঁরা পুরস্কার ও প্রিয়তা অর্জনের জন্যে কাতর ও নত হন, তাঁদের অভিরুচিতে আমার রুচি সাড়া দেয় না। পনের কি কুড়ি বছর ধরে এই যে জড়িয়ে থাকা লেখার সঙ্গে, এই যে মেতে থাকা শব্দ ও অক্ষর নিয়ে- এর মূল্যই বা কম কী!

এ-সব এখনই ভাবছি, লেখা শুরু করার অনেক বছর পরে ; এই লেখার সূত্রে। ষোল কি সতেরোয় যখন হঠাৎ একদিন লিখতে শুরু করি, তখন নিশ্চয়ই অতশত ভাবি নি। তখন শখটাই ছিল বড়ো। হয়তো তার সঙ্গে ছিল কাগজে নাম ছাপানোর লোভ, পাঁচজনের সপ্রশংস দৃষ্টিপাতে ধন্য হওয়ার ইচ্ছা। তাও যে খুব প্রত্যক্ষভাবে ছিল তা নয়। ছোটবেলা থেকেই বেশ বই পড়ার ঝোঁক ছিল আমার, নির্বাচনে বাছ-বিচার ছিল না! এ-ব্যাপারে যেহেতু কেউই আমাকে বলে দেননি কিছু, তাই কালানুক্রমিক রচনাপাঠের সুযোগ আমার কোনোদিনই হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু বই পড়ে ওঠার আগেই আমি পড়েছি তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের রচনা—এমনকি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের রচনাও। পড়েছি বইয়ের চেয়েও বেশী পত্রিকা। তখন কলকাতা থেকে ঢের দূর মফঃস্বলে যে দুটি সাহিত্যের কাগজ মূল্যবান ও সহজলভ্য ছিল, তার একটি 'দেশ', অন্যটি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়। স্কুলের শেষ দিকেই এই দুটি কাগজের প্রতি আমার আকর্ষণ হয়ে ওঠে প্রবল। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, চতুরঙ্গ প্রভৃতি

পত্রিকাগুলিও পাওয়া যেত কখনোসখনো। কলেজে ঢুকেই আমি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যাই। ত্রৈমাসিক কাগজ, তাও বেরুত না নিয়মিত ; এ-জন্যে প্রায়ই অনুযোগ করে চিঠি দিতাম কবিতাভবনের ঠিকানায়। প্রায় পত্রপাঠ কাগজের খবর নিয়ে আসত 'বু-ব' স্বাক্ষরিত পোস্টকার্ড। বুদ্ধদেব বসু যেদিন মারা যান, তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে পড়ে, কোনো লেখকের স্বাক্ষরিত চিঠি আমি প্রথম তাঁর কাছ থেকেই পাই। পরবর্তী সময়ে তিনি আমাকে অনেক দয়া করেছেন ; তার কিছু বিবরণ আছে ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'স্যার' নামক রচনায়।

ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর লাইব্রেরীটি আকারে বড়োসড়ো হলেও, তখন অন্তত, ছিল একটু এলোমেলোভাবে সাজানো—তালিকাভুক্ত বইয়ের অনেকগুলিই পাওয়া যেত না, অনেক বই-ই থাকত অতিপঠনে জীর্ণ। মার জন্যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বই আনতে সেখানে ছুটতে হতো আমাকে। বই পড়ার নেশাটি সম্ভবত আমার মার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। আর একটি সূত্র ছিল আমাদের স্কুলের লাইব্রেরী ; সেখানে প্রতি শনিবার নিয়ম করে ছাত্রদের 'বিবেকানন্দ চরিত' থেকে শুরু করে ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'জলে জাগে ঢেউ' পর্যন্ত সব রকমের বই দেওয়া হত। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বোঝার জন্যে আলাদা বয়সের দরকার হয় না —স্কুল লাইব্রেরীর বই হলেও তার মধ্যে অনেকগুলি থাকত স্বাদু মন্তব্যসহ দাগানো। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'কামসূত্র' বিষয়ে অভিজ্ঞ, ধূমপানে পটু এবং দস্যিপনায় বেপরোয়া।

যে-স্কুলে আমি পড়েছি তার নাম 'দুর্গাচরণ'। সেখানে বিশেষভাবে বাঙালী ছেলেরাই পড়ত বলে লোকমুখে এর নাম হয়ে গিয়েছিল 'বাংলা স্কুল'। ছোট বয়সে একদা শরৎচন্দ্রও পড়েছিলেন এই স্কুলে। পড়াশুনায় দুর্গাচরণের সুনাম ছিল ; সুনাম রক্ষার জন্যে

মাস্টারমশাইরাও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তখন স্কুলের গণ্ডি পেরুতে হত সেকেণ্ডারী বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে, ক্লাস ইলেভেনে। ক্লাস নাইন থেকেই শুরু হয়ে যেত তার তোড়জোড়। আমাদের হেডমাস্টারমশাই অমূল্যবাবুর ধারণা ছিল পরীক্ষায় ভালো করতে হলে ইংরিজিটা শেখা দরকার। ম্যাট্রিকে ভালো ফল দেখাতে পারে এ-রকম কিছু ছাত্রকে তিনি আগে থেকেই বেছে রাখতেন ; ক্লাস নাইনে পৌঁছুলে লাইব্রেরী থেকে তাদের আর বাংলা বই দেওয়া হত না—বাধ্য করা হতো ইংরাজী বইপড়তে। ঐ সময়ে আমার ডিকেন্স, স্কট, জেন অস্টেন, মপাসাঁ প্রমুখের কিছু বাছা বাছা বই পড়ার সুযোগ হয়।

স্কুলে পড়তে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আমি দু'একটি গল্প লিখেছি, সেগুলির সবই বিষয়-নির্ভর হালকা রচনা। দু'একটি পুরস্কারও পেয়েছিলাম। পাটনার কোনো এক সংস্থা একবার স্কুলের ছাত্রদের জন্যে এক সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ; বিষয় মনে নেই, তবে মনে আছে সেই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছিলাম আমি। কাগজে নাম ছাপা হলো সেই প্রথম। তখন মাস্টারমশাইরা ছাত্রদের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন ; আমার ঐ ক্ষুদ্র কৃতিত্বেও অসামান্য গর্ববোধ করেছিলেন তাঁরা। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে এঁদের উৎসাহ শৈশবেই আমাকে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিল। এই লেখা লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, আমার শিক্ষকভাগ্য সত্যিই অসামান্য। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ি, তখন আমার শিক্ষক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, ফাদার ফাঁলো, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা। যে-কোনো সাহিত্যের পড়ুয়ার পক্ষে একসঙ্গে এতোজন মনীষী শিক্ষকের সাহচর্য লাভ নিশ্চিত ভাগ্যের ব্যাপার ; সাহিত্য বিষয়ে বোধবুদ্ধি পরিচ্ছন্ন করা এবং রুচি

তৈরির ব্যাপারে তো বটেই। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, এঁদের সংস্পর্শে এসে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও আমার ব্যাপক পরিচয় ঘটে।

অনেকেই থাকেন, লেখার পরিশ্রমে যাঁরা ক্লান্তি বোধ করেন। আমার কোনোদিন এ-রকম হয়নি। নানা ছাঁদের অক্ষরের লাইন ধরে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে ছোটবেলা থেকেই আসক্তি ছিল; এমনকি অন্য কোনো কাজ না থাকলে পাঠ্যবই থেকে কপি করে ভরিয়ে তুলতাম খাতার পাতা। সাহিত্যচর্চার গোড়ার দিকে ভালোমন্দ না ভেবেই যে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী লিখতাম, তার পিছনে শৈশবের এই প্রবণতা কাজ করে থাকতে পারে। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় আমার নাটক ও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল, কিছু-কিছু সমিল পদ্য রচনারও। পাঠ্য বইয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না থাকায় পরীক্ষায় ব'সে পড়তাম বিপদে। তখন, আত্মরক্ষার তাগিদেই, ভাবতে হতো বানিয়ে লেখার কথা। এইভাবে অনেক নাটকের মুখস্থ করা সংলাপ বা স্বরচিত পদ্য জুতসই করে চালিয়ে দিতাম পরীক্ষার খাতায়—সেগুলি বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যে থাকত 'কবির ভাষায়' গোছের কোনো সূত্র। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে নির্দ্বিধায় ব'লে দিতাম কোনো একটি নাম। বানিয়ে লেখার একটা মজা আছে, তা কল্পনার অনেক জানালা-দরজা খুলে দেয়।

আমার প্রথম প্রকাশিত বা প্রথম দিকে প্রকাশিত রচনার সঙ্গে কোনো পরিশীলিত মন ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির সম্পর্ক ছিল বলে মনে করি না। তাদের পিছনে যতো আবেগ সবই ছিল কৈশোরক, এক ধরনের শখ থেকে উদ্ভূত। এইভাবেই, আমি যখন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে, ১৯৫৫ সনে, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমার প্রথম গল্প 'ছন্দ-পতন'। যতোদূর মনে পড়ে, সেদিন ছিল ৩০শে জানুয়ারী। বিবাহিত দুই বোনের সুখ-দুঃখ নিয়ে একটি সাদামাটা গল্প—ডাকে পাঠিয়েছিলাম সম্পাদকের দপ্তরে, ছাপা হবে

আশা করিনি। তবু ছাপা হলো। বোধ হয় এর পরের গল্পটিরই নাম 'নিয়ম', ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। সাধারণ এক কনস্টেবলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওই গল্পে ছিল ওপরতলার মানুষের রূঢ়তা, স্বেচ্ছাচারিতা ও হৃদয়হীনতার কথা। গল্পটি পাঠানোর মাসখানেক পরে ফেরত আসে দেশ-এর সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে, সঙ্গে দশ বারো লাইনের চিঠি—তাতে গল্পটির দু' একটি অংশ পরিবর্তন ক'রে আবার পাঠানোর নির্দেশসহ ছিল একটি বাড়তি পংক্তি: 'আপনার আশা নিশ্চয়ই পূরণ হবে'। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বিমল কর—লেখা সম্পর্কে নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আমার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অনেকেই যাঁর কাছে ঋণী।

বিষয় ও বক্তব্যের মিল না থাকলেও 'নিয়ম' গল্পটির ভাষাবিন্যাসে সুবোধ ঘোষের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সত্যি বলতে, প্রায় প্রস্তুতিহীন-ভাবে যখন আমি হঠাৎ লেখা শুরু করি, গোড়ার দিকের সেইসব রচনায় শুধু সুবোধ ঘোষ কেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবও কম ছিল না; পরবর্তীকালে প্রায় এককভাবে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বিমল কর। এর কারণ কি অভিজ্ঞতার অভাব? হয়তো। মাটি কাঁচা থাকলে তাকে যে-কোনো ছাঁচেই ঢালা যায়। এইসব লেখকরা যে সেই সময় আমার ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং সহজেই, তার কারণ একটিই: তখন আমি ছিলাম নিতান্তই একজন লিখিয়ে, মন ছিল অপরিণত, নিজস্ব অভিজ্ঞতা-নির্ভর সত্তা ব'লে কিছু গড়ে ওঠেনি; যে-কোনো ভালো লাগাকেই গ্রহণ করেছি নিজের মতো ক'রে।

খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা সাহিত্যজীবনের সূচনায় কোনো-না-কোনো প্রভাব ছাড়াই উপস্থিত করেন নিজেকে। কিন্তু, অভীপ্সা সৎ হলে একদিন-না-একদিন তাঁকে ভাবতেই হয় পরিবর্তনের কথা, নিজস্ব উপলব্ধির কথা। এই ভাবনার সময়টা সোজা সিঁড়ি ওঠার

মতোই দুরূহ—এই পর্বে এসে হাল ছেড়ে দেন বা হাঁফিয়ে ওঠেন এমন লেখকের সংখ্যাও অনেক। আমার সান্ত্বনা, আমি হাল ছাড়িনি; ব্যবহৃত পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাকটি চিনে নেবার জন্যে চেষ্টা করেছি প্রাণপণ। ফলও যে পাইনি তা নয়। এরই ফলে, সূচনার দিন থেকে এ-পর্যন্ত আমি যা লিখেছি, তাকে পরিষ্কারভাবে ভাগ করা যায় দুটি পর্বে --১৯৬৪-৬৫'র আগে এবং ঐ সময়ের পরে। ভালো হোক বা মন্দ, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি যে একান্তভাবেই আমার—পরিবর্তনেব চিহ্নবাহক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো। স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আমার ব্যক্তিগত জীবনও আমূল বদলে গেছে ততোদিনে; অন্তত এটুকু বুঝতে শিখেছি, কি জীবনে কি লেখায় আমাকে ধন্য করার জন্যে কেউ বসে নেই; এ এক দূরপাল্লার দৌড়—শুরুর খুঁটিটা মনে থাকলেও, শেষের খুঁটিটা ক্রমাগত সরে সরে যায়। এই ভূমিকায় বাঁচার একমাত্র উপায় মেরুদণ্ড টান করে রাখা।

১৯৫৬ থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে বেরুতে থাকে আমার গল্প: সবই ডাকে পাঠানো। মনে আছে, সাতান্ন সনের কোনো এক সময় কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে আমি যখন আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে ঢুকলাম, তখন আমার দিকে তাকিয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মন্মথনাথ সান্যাল এতোই অবাক হয়েছিলেন যে, আমাকে কিছু জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন তাঁর সহকারী। মন্মথবাবু বললেন, 'নীরেনবাবু, এযে দেখছি নিতান্তই বাচ্চা ছেলে!' কথাবার্তায় তখনই সপ্রতিভ নীরেন্দ্রনাথ; আমার অস্বস্তি লক্ষ করে বললেন, 'বাচ্চা হলে কী হবে, লেখেতো বড়োর মতো! তা হলেই হলো!' নিজের হাতে চেয়ার টেনে আমাকে বসতে দিলেন নীরেন্দ্রনাথ, বললেন,' বেশ হচ্ছে লেখা! আপনার 'বৃষ্টি' গল্পটা আমাদের বার্ষিক সংখ্যায় ছাপছি। খুব তাড়াতাড়ি আর একটি গল্প পাঠিয়ে দেবেন।'

সাহিত্যক্ষেত্রে আমাকে পরিচিতি দানের ব্যাপারে মন্মথবাবু ও নীরেন্দ্রনাথের অবদান অনেকখানি। এর দু' তিন বছর পরে বেরুল আমার প্রথম গল্পের বই 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি'। মন্মথবাবু তখন রবিবাসরীয় ছেড়ে আনন্দবাজারের স্তম্ভ লেখক। বইটি হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'সেই রাণীর গল্পটি নেই কেন এতে, সেই যে 'অন্ধকার পেরিয়ে'। অতো ভালো গল্প বাদ দিলে!' ঘটনা হিসেবে সামান্য হলেও, মন্মথবাবু যে কতো যত্ন নিয়ে ও খুঁটিয়ে সব লেখা পড়তেন এবং মনে রাখতেন, এই একটি সংলাপেই তা পরিষ্কার হবে।

লেখক গড়ে ওঠে তার নিজের অভিরুচিতে, তার ব্যক্তিগত বোধ-বুদ্ধি-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। ভালো লেখার জন্যে প্রশংসা যেমন সাহায্য করে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে, তেমনি দোষত্রুটি, অসম্পূর্ণতার জন্যে ধিক্কারও তার প্রাপ্য। বাইরের সমালোচনা, আর কিছু না হোক, পারে তার আত্মদর্শন-ও-সমালোচনার চোখ পরিষ্কার করতে—নিয়ে যেতে গ্রহণ, বর্জন ও নির্বাচনের দিকে। আমার সৌভাগ্য, প্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্বে আমি এমন কয়েকজন লেখক বা সম্পাদকের সংস্পর্শে এসেছি, যাঁরা একই সঙ্গে উপদেশ ও ধিক্কার দিয়ে লেখা সম্পর্কে নতুন ক'রে ভাবতে সাহায্য করেছেন আমাকে; কিন্তু কখনোই নৈর্ব্যক্তিক বা উদাসীন হননি। এঁদের একজন বিমল কর, অন্যজন রমাপদ চৌধুরী। ঘটনাচক্রে এঁরা আমার অনেক লেখারই প্রথম পাঠক—প্রশংসায় স্বতঃস্ফূর্ত, সমালোচনাতেও প্রখর। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে ধৃষ্টতা হবে; তিনি সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষবাবুর মতো যত্নবান পাঠক সবকালেই দুর্লভ; কোন লেখাটি কেমন হলো তা জানাবার জন্যে তিনি কোনোদিনই লেখকের মুখোমুখি হবার অপেক্ষা করেন না—টেলিফোনের দূরত্ব থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে শোনা যায় তাঁর গলা, তাঁর উচ্ছ্বাস ও বিশেষণ-বহুল প্রশংসা।

আমাদের চারপাশের পরিবেশ যতো ব্যাপ্ত হচ্ছে ততোই সঙ্কুচিত হচ্ছে মানুষের ঔদার্য ও ভদ্রতাবোধ, স্নেহ ও সৎ-নিরপেক্ষতা। আমার সৌভাগ্য, এ-সবের কিছু-কিছু পরিচয় আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি।

ভাগলপুরে কলেজে পড়বার সময়েই আমি একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিই; দিনের পর দিন, পরীক্ষার পড়া এড়িয়ে প্রায় রাত জেগে শেষ করি ফুলস্ক্যাপের তিনশো পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ পাণ্ডুলিপি। বিষয়ঃ প্রেম, যে-প্রেমে ব্যর্থতা বৈধ থেকে অবৈধে যেতে এবং যুবক-যুবতীর জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে প্রকাণ্ড এক জগাখিচুড়ি পাকাতে একটুও দ্বিধা করেনি। আজ এতোদিন পরে ঐ উপন্যাস নিয়ে ঠাট্টায় প্রবৃত্ত হলেও সেদিন কিন্তু সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি নতুন স্বামীর আগ্রহে সমস্ত আবেগ ও পরিশ্রম বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার প্রতি। আমার প্রথম উপন্যাস (এবং প্রথম প্রকাশিত বই) 'সিন্ধু বারোয়াঁ।' যদি ভবিষ্যতের সমালোচকদের চোখে এক অসামান্য দৈন্যের প্রতিভূ হয়ে দেখা দেয়, তাতে বিচলিত হবো না। লেখক হবার জন্যে সেই আঠারো-উনিশ বয়সে আমি এতোই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে উপন্যাসটি পরিমার্জনা করার বা আদ্যন্ত ফিরে লেখার কথা ভাবিনি। সমালোচকহীন সেই মফঃস্বল শহরে এমন কেউই ছিল না যে আমাকে দ্বিতীয় মত গ্রহণে সাহায্য করবে। আমি লেখক, আমিই তার পাঠক, ইতিমধ্যেই পিঠে পড়ে গেছে পরিচয়ের ছাপ, সুতরাং তর যে সইবে না তাতে আর আশ্চর্য কি! অসুবিধে হলো, উপন্যাস তো লিখলাম, ছাপবে কে! মফঃস্বলে থেকে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন, যোগাযোগের অভাব অনেক সময়েই তাঁদের আত্মপ্রকাশের পক্ষে একটি বড়ো অন্তরায়। ইতিমধ্যে আমার যে-সব গল্প, কবিতা কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তার সবই পোস্টাপিসের মাধ্যমে হলেও অপরিচয় সেতু-বন্ধনে বাধা সৃষ্টি করেনি কোনো।

কিন্তু, উপন্যাসও কি ছাপানো যাবে ঐভাবে? চিন্তাটা কিছুদিন ভারাক্রান্ত করে রাখলেও শেষ পর্যন্ত আবার পোস্টাপিসের শরণই নিতে হলো। 'আভেনির' নামে একটি ছোট প্রকাশন সংস্থা সেই সময় রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি বই শোভনভাবে ছেপে বেশ নাম করেছিল। কপাল ঠুকে একদিন রেজিস্ট্রি ডাকে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দিলাম সেই ঠিকানায়। আশ্চর্য, অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে সেটি গ্রহণ করলেন তরুণ প্রকাশক অমলেন্দু চক্রবর্তী। মুদ্রিত অবস্থায় যদিও তিনশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি কেটে ফুটে সওয়া-শো পৃষ্ঠায় কমিয়ে আনা হয়েছিল, তাতে তার অঙ্গহানি ঘটেনি। এখন ভাবি, বাকী অংশটুকুও বর্জিত হলে মন্দ হতো না!

সেটা ১৩৬৬ সনের শ্রাবণ মাস। ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে আমি ততোদিনে কলকাতায় এসেছি। এক বৃষ্টির সন্ধ্যায় বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলের এক অন্ধ গলির দপ্তরীখানা থেকে দু' বগলে দু' প্যাকেট বই ও সঙ্গে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অমলেন্দু। হাতে বই দেবার আগে পকেটে গুঁজে দিলেন একটা আনকোরা একশো টাকার নোট। অভিভূত আমার মুখে কথা ফোটেনি কোনো। টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় ক'রে আমরা হাঁটছিলাম কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে। 'যাক, আপনার প্রথম বই তাহলে বের করতে পারলাম!' অমলেন্দু হঠাৎ বললেন আপনি যখন বড়ো লেখক হবেন, তখন আজকের দিনটার কথা মনে থাকবে তো?'

বড়ো লেখক হওয়া কাকে বলে জানি না। এ-সম্পর্কে আমার সামান্য যেটুকু ধারণা, তার ধারে কাছে আজও পৌঁছুতে পারিনি। তবে যতো দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে স্মৃতি সঞ্জীবিত হচ্ছে আরও। একদা যে-সব ঘটনা ও বিষয়কে তুচ্ছ করে দেখেছি, যাদের অর্থ করতে পারিনি, বা করলেও করেছি ভুল অর্থ—এখন তারা ফিরে আসে নতুন তাৎপর্য নিয়ে। আসে বিস্মৃত অনেক মানুষ ও সম্পর্ক; বাল্য

কৈশোর ও যৌবনে বুদবুদের মতো চকিত আভাস দিয়ে হারিয়ে-যাওয়া অনেক বৃত্তান্ত, স্মৃতির রূপ ধরে—জ্বলে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রে ফসফরাসের মতো। লেখককে গড়ে তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা পরিশীলিত হয় তার অনুভূতি ও বোধের মধ্যে দিয়ে—এ-সবের মধ্যে দিয়েই আসে তার সম্পূর্ণতা। শুধু বাইরে তাকানো নয়, তাকে তাকাতে হয় নিজের দিকেও। এ-সব বাদ দিয়েও যে কিছু করা যায় না তা নয়; কিন্তু, তা হবে অকিঞ্চিৎকর, নিতান্তই বানানো গল্পের পসরা—দুপুরের বিছানায় আলস্য মিশিয়ে পড়বার মতো। এ-রকম লেখার ছড়াছড়ি ও আদর সবকালে ও সর্বত্র। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আমার গোড়ার দিকের অনেক রচনাই এই পর্যায়ের। খোঁজ করলে সে-সব লেখায় হয়তো ভাষায় লাবণ্য কি কাহিনী গঠনের নৈপুণ্য পাওয়া যাবে—তার বেশী কিছু নয়। আজ, এই মুহূর্তে, যদি কেউ ঐ ধরনের রচনা পুড়িয়ে ফেলার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন, তাহলে আমি নিজেই আমার রচনার একটি তালিকা পেশ করব।

যে-পরিবেশে আমার বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে, তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি না থাকলেও, তাকে ঠিক সাহিত্যের উপযোগী পরিবেশ বলা চলে না। একটা সময় পর্যন্ত আমাদের পরিবারে হাসিখুশী ছিল অনন্ত, প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব ছিল না। গোয়ালে গরু ছিল, খাঁচায় পাখি, রাস্তা থেকে নেড়ী কুকুর ধরে এনে পোষ মানানো হয়েছিল বাড়িতে। আমরা দুঃখের কথা ভাবতাম না—জীবন-যাপনের সাবলীল স্বয়ংক্রিয়তার আড়ালে ভাগ্য, নিয়তি বা আকস্মিকতারও যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে, কোনোদিনই তা মনে হয়নি।

আমাদের আদি নিবাস বাঁকুড়া জেলার বেতুড় গ্রামে। বিশের দশকের শেষে—স্বাধীনতাসংগ্রাম যখন বেশ জোরালো, রাজনৈতিকসহ

অন্যান্য কারণে বাবা দেশছাড়া হন ; স্থায়ী হন বাঙালীপ্রধান শহর ভাগলপুরে এসে। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের নেতৃত্বে বিহারেও তখন রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ তীব্র ; এই আন্দোলনে তিনিও শরিক হন। এ-সব আমার জন্মের অনেক আগের ঘটনা ; এ-সবই আমি শুনেছি। বাবার প্রকৃতিতে ছিল রৌদ্রের আধিক্য ; হাসিখুশী, মিশুকে ও পরোপকারী স্বভাবের জন্যে ভাগলপুর শহরে সর্বস্তরের ও সর্বভাষার মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। জীবনের গোড়ার দিকে নানারকম অস্থিরতার কারণেই সম্ভবত জীবনধারণের জন্যে তিনি কোনোদিনই পাকা বন্দোবস্তের ভিতরে যাননি। ফলে করেছেন অনেক কিছু—ব্যবসা ও শেয়ার-ডীলার সিণ্ডিকেটের ম্যানেজারি থেকে শুরু করে শেষ বয়সে বায়োকেমিক চিকিৎসা পর্যন্ত, অনেক কিছু। একটা সময় পর্যন্ত উপার্জনও করেছিলেন প্রচুর। বাবার স্বভাবে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকলেও তাঁর যথেচ্ছ ও পরোপকারী মনোভাব সঞ্চয়ের দিকে মন দেয়নি ; জীবনের শেষ-দিকে এ-জন্যে তিনি অসীম কষ্ট ভোগ করেন। কষ্টের শেষ হয় তাঁর অকালমৃত্যুতে।

বাবার জীবদ্দশায় আমাদের পরিবারে মার ভূমিকা ছিল চাপা। ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, স্বামীর পরিচর্যা ও ঘর-সংসার আগলানো ছাড়া তাঁর আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। দুপুরের অবসরে মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে গল্পের বই পড়া ছিল তাঁর একান্ত বিলাস। বয়সে এখন তিনি প্রায় বুড়ী ; বাবার মৃত্যুর পরে সংসারের জন্যে দীর্ঘ সময়ের দুশ্চিন্তা তাঁর মনোভঙ্গিতে কিছু কাঠিন্য আনলেও, বই পড়ার অভ্যাস এখনো যায়নি।

অশান্তি না থাকলেও আমাদের পরিবারে ছোটখাটো দুঃখ ছিল ; ছোট বয়সে এ-সবের সূত্র ধরা সম্ভব ছিল না। হেঁশেলে উনুনের সামনে বসে রান্না করতে করতে মাঝে-মাঝে চুপচাপ চোখের জল ফেলতেন মা, তখন বড়োই নিঃসঙ্গ লাগত তাঁকে। চারিদিকের

বিপুল আনন্দ ও প্রশান্তির মধ্যে থেকেও এ-রকম অনুযোগহীন, নিঃশব্দ কান্না আমি কাঁদতে দেখেছি আরও অনেককে—রোগশয্যার শেষ দিকে আমার বাবাকেও, তখন তাদের চারিদিকে ক্রমাগত ঋতু-বদল করত নিরুপায় অসহায়তা। তখনই মনে হতো নিজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষই বড়ো একা ; একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যতোই নিবিড় হোক, মাঝখানে কোথাও আছে এক অতিকায় লোহার দরজা—ভারী খিল আঁটা, তার আড়ালে বসে প্রত্যেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে নিজের অপূর্ণতা, কথা বলছে, কেঁদে যাচ্ছে আপন মনে। দূর থেকে দেখা, তবু এই আবছা বোধ সেই ছোট বয়সেই আমার মনে ঘনিয়ে তুলত এক ধরনের একাকিত্ব। তখন জানতাম না, আবছা এই বোধ একদিন আমাকে নিয়ে যাবে বিশ্বাসের দিকে। গল্পে ততোটা না হলেও, প্রকারান্তরে এই বোধ গোড়ার দিকে লেখা 'সেদিন চৈত্রমাস', 'ভেবেছিলাম', 'মধ্যরাত' প্রভৃতি উপন্যাস থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত প্রকাশিতআমার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই কমবেশী উপস্থিত ; বিশেষত শেষের দিকের চারটি উপন্যাস—'আমরা', 'বৃষ্টির পরে', 'বিনিদ্র' ও ,চরিত্র'র মধ্যে। পটভূমি, কাহিনী, সমস্যা ও চরিত্র সমূহে বিভিন্নতা থাকলেও দূর বেহালার সুরের মতো এই অপূর্ণতা, অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতার বোধই সম্ভবত এইসব রচনায় মুল আবহ। এদের যদি কোনো সার্থকতা থাকে, তা এই মূল সত্যকে স্পর্শ করার জন্যেই।

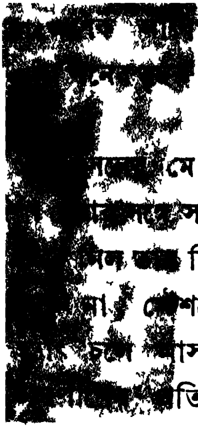
ছোটবেলায় আমি ছিলাম খুব ডানপিটে, যা ঠিক আমার খেলাধুলায় অনুরাগের জন্যে হয়নি। একতলার ছাদ থেকে পরিণাম না ভেবে মাটিতে লাফানো, কিংবা সাঁতার না জেনে স্টীমারের চত্বর থেকে বর্ষার ভরা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া, ভূতুড়ে বলে কথিত পরিত্যক্ত সমাধিভূমিতে অন্ধকারে ভূতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া ও ভূতের উদ্দেশ্যে হিসি ক'রে ফিরে আসা, গৃহস্থের হাঁস চুরি ক'রে মাংস রেঁধে খাওয়া, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামা—সবই হয়েছিল

আমার স্বভাবের অঙ্গ। হাত-পা ভাঙা বা মাথা ফাটানো, এগুলোও হয়ে উঠেছিল নৈমিত্তিক; আমাকে নিয়ে মার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বাড়িতে থেকেও বাড়ি-ছাড়া আমি সে-সময় অনেক নিষিদ্ধ ও গোপনের সন্ধানও পেয়েছিলাম—মানুষের যৌনতাবোধ সম্পর্কে তখনো প্রগাঢ় কোনো ধারণা গড়ে না উঠলেও পিঁপড়ের নিঃশব্দ হেঁটে চলার মতো শুদ্ধ চৈতন্যের নীচে তার ক্রমাগত আরোহণ-অবরোহণ সচেতন ক'রে তুলেছিল আমার দৃষ্টি ও অনুভূতি। অস্পষ্ট-ভাবে হলেও তখনই মানুষের ভিতরে মানুষের গোপন অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, দ্বৈতসত্তার এই উপস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়। এ-সব ধারণা আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে।

ভাগলপুরের জল-হাওয়া-প্রকৃতিতে ছিল একই সঙ্গে রুক্ষ ও কোমলের মিশ্রণ। মানুষের আচরণ ও ব্যবহারে তার অব্যবহিত প্রকৃতির প্রভাব সত্য হলে, সেখানের মানুষজন ও সামাজিক পরিবেশেও ছিল বৈপরীত্য। প্রায় ফি-বছরই কলেরা ও বসন্ত আসত মহামারীর বিভীষিকা জানিয়ে; সঙ্গে আসত ভুঁইফোঁড় সাধু ও অবতাররা—ভিক্ষায় ত্রুটি হলে দু' হাত তুলে অভিশাপ দিত ব্যক্তি-মানুষকে। বন্যায় ভেসে যেত নদীর ওপারে মানুষের ঘরবাড়ি, চাষীদের কুঁড়ে। তবু, জন্ম বা মৃত্যু কোনোটির জন্যেই কারুর মাথাব্যথা ছিল না। যে-সময়ের কথা বলছি তখন সেখানের বাঙালীদের মধ্যে চলেছে নৈতিক-ও-অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পালা। পেশা ও শিক্ষাগত একদার বিস্তৃত রবরবা থেকে বিচ্যুত তাঁরা ক্রমশ গ্রহণ করে নিচ্ছেন ক্লেশ ও সঙ্কীর্ণতা; দেশে থেকেও ক্রমশ কুক্ষিগত করছে উদ্বাস্তু হবার ভাবনা। পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে সদ্ভাব থাকলেও তাঁদের মধ্যে আড়াল-কাতরতার অভাব ছিল না। এরই মধ্যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান কেউ কেউ মাথা চাড়া দিতেন লোক-স্বার্থ তুচ্ছ ক'রে।

ঘিঞ্জি ও নোংরা এই শহরটি দিনে ঘাড়কুঁজো করে চাঞ্চল্যে মিশে গেলেও, সন্ধ্যার পর-পরই ধারণ করত অন্যরূপ। অন্ধকার ও আচ্ছন্নতায় মেশা সে-রূপ ঠিক কেমন ছিল তা বুঝিয়ে বলা কঠিন; তবু, আমাকে অন্তত, এই রূপ একটা কিছু ঘটার আশঙ্কায় নিঝুম ক'রে রাখত। নির্জনতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত শেয়াল, কুকুরের ডাকে। ঘটনাচক্র কি না জানি না, আমাদের ছোটবেলায় এই শহরের অনেক দুঃসংবাদের পটভূমিই তৈরি হতো রাতে। কতোদিন আগে শোনা, তবু এখনো গভীর রাতে 'রাম নাম সত্ হ্যায়—' ধ্বনি দিতে দিতে শববাহকদের এগিয়ে যাওয়া, কিংবা উত্তীর্ণ মধ্যরাতে আমাদের ঘুমের মধ্যে 'অন্ধ' নাচার কো দেগা রাম —', উদাত্ত বেদনায় ভরা এই গান গাইতে গাইতে অন্ধের হেঁটে যাওয়া—এইসব শব্দ ও ধ্বনির ব্যঞ্জনা আমার কানে লেগে আছে এখনো। এই অন্ধ আতুরটিকে কখনো চোখে দেখিনি; অতো রাতে সে কোথা থেকে আসত এবং কোথায় যেত, সে-সম্পর্কেও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু, সে ছিল, হয়তো এখনো আছে। হয়তো থেকে যাবে—দৃষ্টিবানের পৃথিবীতে অন্ধতার বোধ জাগিয়ে তুলতে, চিরকাল, এক অজানিত 'রাম' এর কাছে তার অপূর্ণতা জানাতে। আমার 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাস এবং 'দুঃসময়', 'একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু' এবং আরও দু'একটি গল্প এই শহরের পটভূমিতে লেখা। কিছু-কিছু কল্পনার আশ্রয় নিলেও এগুলি বানানো রচনা নয়, মানুষ বা চরিত্রগুলিও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নয়। মজার কথা, অনুরূপ পরিবেশ ও মানুষজনের মধ্যে থেকে আমি যখন সাহিত্য-রচনায় ব্যাপৃত হই, সে-সময় এই পটভূমি আমাকে আকর্ষণ করেনি। করল প্রায় পনের বছর পরে, যখন নিশ্চিত নাগরিক মনন ও জটিলতায় পরিক্রম করছে আমার লেখা ও লেখা সম্পর্কিত ভাবনা—'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসের অব্যবহিত আগে এবং পরে লেখা 'প্রণয়চিহ্ন'-'সম্পর্ক', 'সন্ধিক্ষণ', 'আমরা' কিংবা 'বিনিদ্র' বা 'চরিত্র' পড়লে যে-কোনো পাঠকই এই ভূমিকাটি আঁচ করতে পারবেন।

সম্ভবত এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। ব্যক্তিগত জীবনে ইতিমধ্যে আমি বদলে গেছি অনেক—এখন নিজের দিকে তাকালে একদা মফঃস্বল শহরের সেই দামাল ও অনুসন্ধিৎসু কিশোরটিকে খুঁজে পাই না কোথাও। এই পরিবর্তনের জন্যে শুধু যে বয়সই দায়ী তা নয়, দায়ী অন্যান্য অভিজ্ঞতাও, দায়ী বিভিন্ন পরিবেশ, সংস্পর্শ এবং জীবিকা—যা সাধারণ কেরানীগিরি ও সাংবাদিকতায় শুরু হয়ে ক্রমশ স্থানান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞাপন, বিপণন ও জনসংযোগের কাজে। শেষোক্ত জীবিকায়ও কেটে গেল এক যুগের ওপর। সাধারণের কাছে অপরিচিত এই নতুন জগৎ ও মানুষজন তাদের দ্বন্দ্ববহুল অস্তিত্বের টানাপোড়েন নিয়ে বিপুলভাবে স্পর্শ করেছে আমাকেও ; 'সম্পর্ক' ও 'বিনিদ্র' উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যাবে। বাবার মৃত্যুর পর—তাঁর শ্রাদ্ধের ঠিক পরের দিন—নাম-পরিচয়-ভবিষ্যৎ-ও-প্রায় কপর্দকশূন্য আঠারো বছরের আমি যেদিন নিজের ও আমাদের হঠাৎ ভেঙেপড়া সংসারের ভাগ্য ফেরানোর জন্যে ভাগলপুর জংশন থেকে কলকাতার ট্রেনে চড়ি, সেদিন জানতাম না ভাগ্য আমাকে কোনদিকে নিয়ে যাবে। একটা ফাঁকা অভিমান পাষাণভারের মতো চেপে বসেছিল বুকে। মনে আছে, ট্রেন যখন ভাগলপুরের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে, চেনাশোনা দৃশ্যের পরিবর্তে জায়গা করে নিচ্ছে পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টের স্তব্ধতা ও নির্জন গাছ-গাছালি, ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে হঠাৎ-কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম আমি। একসঙ্গে আমার গোটা অতীত, তার পরিবেশ, মানুষ, আত্মীয়তা, তার যাবতীয় সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণতা নিয়ে ভেসে উঠেছিল চোখে। চাকচিক্যহীন, কিছু বা মলিন, ধুলোমাখা এই শহর—যতোই দীন হোক, তার দৈন্যের ভাণ্ড থেকে দিয়ে দিয়ে এতোদিন ভরে রেখেছিল আমাকে। আজ তাকেই ফেলে এলাম পিছনে। কম বয়সের অপরিণত মানসিকতায় এর চেয়ে বড়ো প্রবাসযাত্রা অনুভব করার শক্তি আমার ছিল না। সম্ভবত সে-অভিমান আজও থেকে গেছে,



...গ ঝরিয়ে কেলাসিত হয়েছে আরও; না হ'লে ... পরে 'বৃষ্টির পরে' লেখার প্রয়োজন হবে কেন।

...মে মাসের গোড়ায় একদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে ... সঙ্গে বিরাট ও অপরিচিত শহর কলকাতা আমাকে ... বিশাল হাঁ-এর মধ্যে। কোথায় যাব এবং কী করব ... শনের বাইরে এসেই প্রথম খেয়াল হয়, এইভাবে ... াসায় ঝুঁকি যতটা আছে, আশ্বাস ঠিক ততটা নেই। ...তিটি মুখ অপরিচিত, বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী শব্দের চাপে হৃৎপিণ্ডের চারিদিক ঘিরে তরল হতে থাকে রক্ত। এখানে যদি হঠাৎ কিছু ঘটে, বহুদূর মফঃস্বলে থাকা আত্মীয় পরিজন-দের কাছে সে-খবর পৌঁছুবে তো! তবু, যুগপৎ ভয় ও আশঙ্কা নিয়ে গতির বিরুদ্ধে হাঁটতে শুরু করেছিলাম আমি; সম্ভবত সেদিনই শুরু হয়ে গিয়েছিল পরিবেশের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধ।

১৯২৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ছ' সাতটা বছর শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই আমাকে বহু পরিশ্রম, গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে হয়। তার প্রভাব পড়ে লেখাতেও। আর কিছু না হোক, নিতান্ত শখ দিয়ে যার শুরু এই সময় তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। 'সেদিন চৈত্রমাস', 'ভেবেছিলাম', ও 'মধ্যরাত'—এই তিনটি উপন্যাস এবং 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', 'দুঃসময়' প্রভৃতি ছাড়াও আরও অনেকগুলি গল্প এই সময়ে লেখা। এর কোনো-কোনোটিতে কিছু অমনোযোগ ও দ্রুত লিখনের ছাপ থাকলেও, লেখক হিসেবে আমি যে পরিবর্তিত হচ্ছি—বদলে যাচ্ছে সূচনার ভাষা, চিন্তায় সংযুক্ত হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি ও চরিত্র ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ভিতর থেকে উঠে আসা শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে—তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে।

বস্তুত, সে বড়ো নিঃসঙ্গ সময়: ক্ষুধা, ভয়, একাকিত্ব, অসহায়তা,

মানুষের প্রবঞ্চনা ও অকারণ বিরুদ্ধাচরণ—এই কয়েক
আমাকে উপর্যুপরি এতো আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় যে,
স্বাস্থ্যবান আমার শরীরে দেখা যায় স্নায়ুর চাপ। এক
থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ত ভ্রাম্যমাণ, প্রায়ই টের
থেকে-থেকে অকারণ কাঁপুনি এসে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে শরীর
হতো হেরে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি একটা বিকল্প খুঁজে না পে
টানতে পারব না নিজেকে। কিন্তু, এই বোধও স্থায়ী
বেশীক্ষণ। আশঙ্কা একা আসত না; সঙ্গে নিয়ে আসত জী
সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা—যা ক্লান্তি ও বিষণ্নতা থেকে
নিতে পারে নতুনতর শক্তি সঞ্চয়ের দিকে। আজ এ-সব ব্যাখ্যা অনায়াস হলেও, তখন ছিল না। তবে এই ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ পরবর্তীকালে লেখা আমার কোনো কোনো চরিত্রের মধ্যে হয়তো দুর্লভ নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেও যারা চলে যায় আত্মসংবরণের দিকে, দূরত্বময় উদাসীনতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে নিজেরই দিকে। তারা ভ্রাম্যমাণ, সহনশীল, দুঃখভারাতুর হয়েও কৌতুকপ্রিয়, এবং স্মৃতিজীবী। তাদের উচ্চারিত সংলাপের সঙ্গে তন্মুহূর্তের অনুভবের পার্থক্য বিপুল।

দীর্ঘদিন মফঃস্বলের আপাত-সরল আবহাওয়ায় কাটিয়ে যাঁরা হঠাৎ চলে আসেন কোনো বড়ো শহরে, তাঁদের পেটের খোলই শুধু বড়ো হয় না; অনুভূতি প্রখর হলে দেখার চোখও হয় ভিন্ন। পরস্পরবিরোধী দুই অভিজ্ঞতার টানা-পোড়েনে তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক তৃতীয় অভিজ্ঞতার, যা ক্রমাগত পারাপার করে প্রথম দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে। তাই, বহুবিধ বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, শহরজীবনের আপেক্ষিক নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যেই শেষ হয় না তাঁদের আত্মদর্শন। বিষাদ ও নৈরাশ্যকে যাঁরা একই অভিজ্ঞতার এপিঠ-ওপিঠ বলে ভাবেন, তাঁদের কথা আলাদা; আমি কখনোই এদের পরস্পরনির্ভর বলে ভাবিনি। এই সূত্রেই যদি বলি, কলকাতায়

আসার প্রথম দিকের অভিজ্ঞতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম মূল মানুষের প্রতি, তাহলে ভুল বলা হবে। কারণ শুধু আমার প্রারম্ভিক জীবনের স্থিতিশীলতাই নয়; কারণ, প্রায় একই সময়ে ব্যক্তিগত-ভাবে আমি এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম, যাঁদের মমত্ব-বোধ ও দয়ার কথা ভাবলে কৃতজ্ঞতায় আজও আমার চোখে জল আসে। আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার একার নয়, আরও অনেকেরই। মনে হয়, চারিদিকে এতো ক্লেদ, গ্লানি ও কুশ্রীতার মধ্যেও এখনও যে মানুষ চোখ তুলে তাকায় মানুষেরই দিকে—বন্ধুতা, প্রেম ও আশ্রয়ের জন্যে, ক্ষমাপ্রার্থনা ও চরিতার্থতার জন্যে, তারও মূলে আছে এই রকম কিছু মানুষের শুভবোধ—যাঁরা, স্বার্থহীনভাবে, দুঃস্থ পৃথিবীর দিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছেন শুশ্রূষার হাত।

তবু সবাই কি বেঁচে আছে ঠিকঠাক? মনে তো হয় না। সম্পর্কের পরস্পারিক উত্তাপে প্রাণবন্ত হয়েও মানুষ কেঁপে উঠছে আকস্মিক বিচ্ছেদের শীতে, নিঃসঙ্গতা ত্রাণ খুঁজছে যৌনতায়, বৈধ-অবৈধের সূক্ষ্ম ভেদাভেদের ওপর দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষায় বিলীন হচ্ছে মানুষ, ধরতে পারছে না ঠিক কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য—তখন নিঃশব্দ ও নিরুপায় কান্নায় ফাঁপিয়ে তুলছে রক্ত ও শিরা। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নিয়তিক্লিষ্ট এই তার ভূমিকা, নির্ভরতাহীন; বুঝতে পারে না জৈবিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে দূরত্ব ঠিক কতোখানি—স্মৃতি, দুঃখ ও অপমান নিয়ে বহুর মধ্যে মিশে সে শুধু হেঁটে যাচ্ছে, একা-একা। ঠিকুজি-কুষ্ঠি ও বাহ্যিক ঘটনার ঘনঘটায় তৈরি কোনো মহত্ত্বের উপাদানে সিঞ্চিত নয় সে; কাহিনীর জন্ম যেহেতু তার বুকে ও নিভৃতে, তাই তা শুরু হবার জন্যে প্রার্থনা করে না কোনো নির্দিষ্ট পটভূমি, শেষও হতে পারে হঠাৎ।

স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে বড়ো লেখকরা কীভাবে কাজে লাগান জানি না। লেখা বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মধ্যে

দিয়ে এটুকু বুঝেছি : স্মৃতিই লেখকের সব, অভিজ্ঞতাই তার নির্ভর, অনুভূতিই তার চর্চার পরিপ্রেক্ষিত। এগুলি নিয়েই রচিত হয় তার অভিজ্ঞান—প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি ভাবনা ও সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে যা ক্রমশ এগিয়ে যায় পরিপূর্ণতার দিকে। যে লেখক, সে লিখে যায় সারাক্ষণ ; স্বধর্মে স্থিত হলে একদিন না একদিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় তাব জন্ম-মুহূর্তের পরিচয়, একের মধ্যেই জন্ম নেয় দ্বৈতসত্তা—একজন : যে ব্যক্তি ; আর একজন : যে লেখক। এইভাবে ব্যক্তি যখন চুম্বন করে প্রেমিকাকে বা লিপ্ত হয় যৌন সংসর্গে, ব্যক্তি যখন আহ্লাদিত হয় সন্তানের জন্মে বা প্রিয়-জনকে দাহ করে শ্মশানে, ব্যক্তি যখন প্রশংসা পায় বা লীন হয় অপমানে, তখন, সেই সব মুহূর্তেও, লেখক ভেবে যায় লেখার কথা ; ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় সংযোজিত অনুভূতি থেকে বের করে আনে তার বিষয় ও ভাবনা। শেষ অবধি কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, ধর্মাধর্ম জ্ঞান, উপলব্ধির গভীরতা এবং ভাষাশক্তির ওপর। তার আত্মবিশ্বাসের ওপর।

এই উপলব্ধির ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি আজও। লিখছি, লিখে যাচ্ছি। বাইরের প্রতিবন্ধকতা মূলত লেখা ছাপানোর সূত্রে ; তা নিয়ে এক সময় কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও, এখন আর ওসব ভাবি না। এখন সব চেষ্টাই নিয়োজিত ভিতরের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠায়। কী লিখব'র সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে লিখব, শব্দকে কী ক'রে ক'রে তুলব আরও বেশী অর্থময়, অতিকথন ও বাক্যের যথেচ্ছ যাত্রা থেকে কীভাবে মুক্ত করব ভাবনাকে—ক্রিয়াপদের ক্লান্তিকর পুনরুক্তি থেকে ছাড়িয়ে আনব গদ্যকে, এগুলোও সৃষ্টি করে একরকম প্রতিবন্ধকতা। আবার, এর মধ্যে থেকেও গ্রহণ করা যায় শিক্ষা। সাফল্য বা অসাফল্য পরের কথা ; কিন্তু, যে-ভাষায় ও ভঙ্গিতে আমি 'আমরা', 'বৃষ্টির পরে', 'বিনিদ্র' ও চরিত্র' প্রভৃতি উপন্যাস

লিখেছি, বা লিখেছি দাঁত, মাড়িয়ে যাওয়া, মানুষের মুখ, তিনটি অশ্লীল শব্দ, মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ, জন্ম প্রভৃতি গল্প, তা যে একান্ত ভাবেই আমার ও নিজস্ব ভাষা-ও-ভাবনাপ্রসূত, ব্যক্তিগত এই অনুভব কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। বলা দরকার, গদ্য রচনার পাশাপাশি শুরু থেকে এ-পর্যন্ত কবিতা রচনার আগ্রহও আমার গদ্যভঙ্গিকে করেছে পরিশীলিত।

দেখা, শোনা, জানা নিয়ে অভিজ্ঞতা থেমে থাকে না এক জায়গায়; জলে জল আসার মতো অনিঃশেষ তার প্রবাহ। বিষয় বদলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ধরনও। আমি ও আমরা'র দূরত্ব হয়ে যায় একাকার। এইভাবে, মূল স্রোতে বিশ্বাস রেখেও ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে লেখা। এ-সব লেখাকে পাঠক গ্রহণ করবেন কি করবেন না, সমালোচকরা কি চোখে দেখবেন এবং এগুলি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকবে কি না, লেখার সময় অন্তত এ-সব ভাবনা মাথায় থাকে না। কিন্তু, আজও সাদা পাতায় অক্ষরের পর অক্ষরের জন্মে ও এগিয়ে যাওয়ায় আমার আসক্তি অব্যাহত সেই ছোটবেলারই মতো। তাই, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন লেখ?' তাঁর জন্যে একটিই উত্তর আছে: 'লিখতে ভালো লাগে, তাই!' এইমাত্র, আর কিছু নয়।